বড় মানুষের গল্প

১ম খন্ড, ২য় খন্ড, ৩য় খন্ড

শরীফ আবদুল গোফরান

বড় মানুষের গল্প

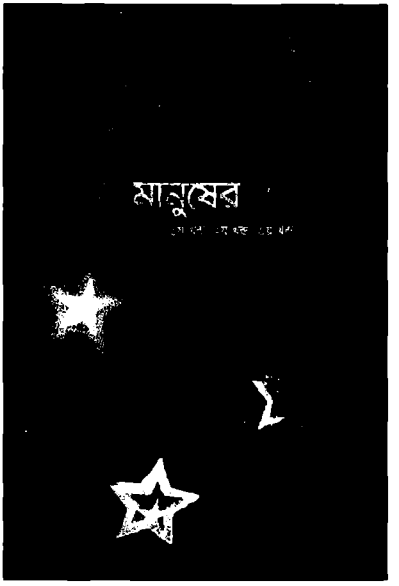

শরীফ আবদুল গোফরান

BCBS

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা, চট্টগ্রাম
www.phulkuri.org.bd

বড় মানুষের গল্প

শরীফ আবদুল গোফরান

প্রকাশক
এস এম রইসউদ্দীন
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৮

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ ঃ স্কেচ ঃ মোমিন উদ্দীন খালেদ

মূল্য ঃ ১৩০.০০টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

BARO MANUSHAR GALPO : Sharif Abdul Gofran, Published by: SM Raisuddin Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000, Price : Tk. 130.00, US$ 4.00

ISBN. 984-493-106-1

www.phulkuri.org.bd

উৎসর্গ

অধ্যাপক ছাইফুল্লাহ মানছুর
প্রিয় মানুষ

www.phulkuri.org.bd

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস-ঐতিহ্য হচ্ছে একটি জাতির চালিকা শক্তি। ইতিহাস বিস্মৃত জাতি হলো আত্মপরিচয় বিস্মৃত এক মানবগোষ্ঠী। শেকড়বিহীন উদ্ভিদ যেমন সামান্য পানির স্রোতের ধাক্কায় ভেসে যায়, তেমনি আত্মপরিচয়বিহীন মানব সম্প্রদায় ও বিজাতীয় সংস্কৃতির সয়লাবে নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে সহজেই যুগের তালে ভেসে যায়। আমাদের ও ইতিহাস ঐতিহ্য আছে। আছে গর্ভ করার মতো অনেক কিছু। কিন্তু অনেক কিছু লিখিত নেই। অথচ যুগে যুগে প্রদীপ্ত সূর্যের আলোকচ্ছটা নিয়ে আবির্ভাব ঘটে বহু মহামনীষীর। যাঁরা জীবনপাত করে জাতিকে জাগরনের জন্য সভ্যতা সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে গেছেন। তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজনের জীবন ও তাদের বৈপ্লবিক অবদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরে শিশু সাহিত্যিক শরীফ আবদুল গোফরান রচনা করেন 'বড় মানুষের গল্প' গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে লেখক তাঁর প্রতিটি লেখা ছোটদের উপযোগী করে লিখেছেন। বড় মানুষের গল্প গ্রন্থে রচিত জ্যোর্তিময় জীবনের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী আমাদের সন্তানদের জীবন চলার পথকে সহজতর করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমরা এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। শিশু-কিশোররা এই গ্রন্থটি পাঠ করে পরিমার্জিত জীবন গঠনের সুযোগ পাবে আশাকরি।

এস এম রইসউদ্দীন
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.phulkuri.org.bd

প্রথম খন্ড

www.phulkuri.org.bd

সূচীপত্র

রূপকথার নায়ক/৭
জমিদার হাসনরাজা/১৩
মহিশুরের ব্যাঘ্র টিপু সুলতান/১৭
জিনদাপীর আওরঙ্গজেব/১৯
মসনদ-ই-আলা ঈশাখাঁ/২২
তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা/২৫
শাহজালাল (রঃ) -এর কবুতর/২৯
হাজী শরীয়তউল্লাহ/৩৩
কর্মবীর মুন্সী মেহেরউল্লাহ/৩৭

www.pathagar.org.bd

রূপকথার নায়ক

আরিফ সাহেব প্রতিদিনকার মতো দহলিজে বসে কোরআন পড়ছেন। বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। সালেহা ও আমিরুলের আজ স্কুল বন্ধ। এই মাত্র পড়ার টেবিল থেকে উঠে এসেছে। বৃষ্টির দিনে গল্প শুনতে তাদের ভালই লাগে।

সালেহাই প্রথম বলল আমিরুলকে, চলো না ভাইয়া দাদুর কাছে গল্প শুনি। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস, তাই করতে হবে। বললো আমিরুল। দু'জনে দৌড়ে গেলো দহলিজে দাদুর কাছে। আরিফ সাহেব দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, কি দাদুরা, লেখা-পড়া শেষ হলো? হ্যাঁ দাদু। এখন কি দুষ্টুমি করবে, না পুতুল খেলে সময় কাটাবে।

না দাদু, আমরা কিন্তু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। বললো, সালেহা। হ্যাঁ দাদু বলে ফেলো তাহলে। উদ্দেশ্যটা কি তাতো জানতে হবে।

আমরা তোমার গল্প শুনবো। বাহ! আমার দাদুরা দেখছি আজকাল অনেক ভাল হয়ে গেছে। বলবো, অবশ্যই বলবো। তাহলে ঠিক করে নাওতো কোন গল্পটা বলা যায়। আমাদের স্যার গতকাল

www.phulkuri.org.bd

বলেছেন, সিরাজ-উদ-দৌলা নামে নাকি একটি বিখ্যাত নাটক আছে, দাদু সেটাই বলো। বললো সালেহা। ঠিক আছে দাদু, একটা বুদ্ধিমানের কথাই বলেছ। ঐ সিরাজ নাটকটিই তো হলো আমাদের বাঙালী মুসলমানদের ইতিহাস। সে ইতিহাস শুনলে তোমাদের কাছে হয়তো রূপকথার গল্পের মতই মনে হবে। কিন্তু রূপকথার গল্প নয়। সেটা আসলেই সত্য গল্প।

সে যাই হোক। আজ থেকে ২৪৪ বছর আগের কথা। তখন পাক-ভারত বাংলা উপমহাদেশ শাসন করতো মুসলমানরা। আর ঐ সময় বাংলার নবাব কে ছিলেন জানো? তখন নবাব ছিলেন আলীবর্দী খাঁ। তাঁরা এক সময় তুর্কিস্তানের বাসিন্দা ছিলেন। আলীবর্দী খাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর ছিলো তিন কন্যা। এরা হলেন-মেহেরুন্নেসা, যাকে সবাই ঘসেটি বেগম বলে জানতো। তারপর ময়মুনা বেগম আর সর্বশেষ হলো আমিনা বেগম। তখন পাটনার শাসনকর্থা ছিলেন নবাবের এক মাত্র ভাই হাজী আহমেদ। এই হাজী আহমেদেরও ছিলো তিন ছেলে। আলীর্বদী খাঁ যথাসময়ে তার তিন কন্যার সাথে ভাই হাজী আহমেদের তিন ছেলের বিবাহ দেন।

১৭৩৩ সাল। নবাব আলীবর্দী খাঁর কন্যা আমিনার ঘরে জন্ম নিলো চাঁদের মতো ফুটফুটে একটি ছেলে। তার সৌন্দর্যে সারা উপমহাদেশ আলোকিত হয়ে গেলো। নানা আলীবর্দী তখন বাংলার নবাব। তিনিতো মহা খুশি। এত সুন্দর নাতির কি নাম রাখবেন তা নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন। তারপর ঠিকই সুন্দর একটি নাম রাখলেন। নামটি হলো মুহাম্মদ। এই আমিনার ছেলে মুহাম্মদই তো আমাদের ইতিহাসে যোগ করে গেছেন একটি অধ্যায়। এ অধ্যায়টি যেমনি করুণ তেমনি গৌরবোজ্জ্বল। এই মুহাম্মদের ছোটবেলার নাম কি ছিলো জানো? আলীবর্দী খাঁ নিজের নামানুসারে নাতির নাম রাখলেন মীর্জা মুহাম্মদ। মাত্র তেইশ বছর বয়সে উপাধিসহ তাঁর পুরো নাম হলো নবাব মনসুর-উল-মুলক সিরাজ-উদ-দৌলা শাহকুলী খাঁ মীর্জা মুহাম্মদ হায়বৎ জঙ্গ বাহাদুর। বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। কি, বুঝলে দাদুরা! হ্যাঁ দাদু, তাতো বুঝলাম, কিন্তু সিরাজের পিতার নাম কি তাতো বললেন না? বলে উঠলো আমিরুল। ও, ও কথা, তা হলে বলছি শোন। নবাব সিরাজের পিতার নাম জয়েন উদ্দীন আহমেদ।

সিরাজ ছিল সুদর্শন। নানা আলীবর্দী সিরাজকে খুবই আদর করতেন। তিনি নাতি সিরাজকে স্নেহের সঙ্গে লালন পালন করেন। যেহেতু ছোট বেলায় সিরাজের

www.phulkuri.org.bd

পিতা মারা যায় এ কারণে মুর্শিদাবাদের হীরাঝিল প্রাসাদে মা আমিনা ও পুত্র সিরাজকে স্থান করেদেন। এই হীরাঝিল প্রাসাদে সিরাজ মাকে নিয়ে থাকতেন। এখান থেকেই তিনি জীবনের যাত্রা শুরু করেন।

শৈশবে সিরাজ কেমন ছিলেন জানো দাদু? তিনি ছিলেন চঞ্চলমতি কিশোর। কিন্তু তিনি নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। সত্য কথা বলতেন।

১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল। নানা আলীবর্দী খাঁ ইন্তেকাল করেন। এ সময় সিরাজ অসহায় হয়ে পড়েন। হয়ে গেলেন অভিভাবকহীন। নানার ইচ্ছা অনুসারে ২৩ বছর বয়সে বাংলার নবাব হলেন তরুণ সিরাজ-উদ-দৌলা। সিংহাসনে আরোহণের পর সিরাজের একমাত্র চিন্তা ও ভাবনা হয়ে উঠলো, ভেতর-বাইরের সকল চক্রান্তের মুখে কি করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। বয়সে তরুণ হলে কি হবে দাদু, সিরাজের রাজনৈতিক পাঠ ছিলো অত্যন্ত নির্ভূল। সিরাজ বুঝতে পারলেন ইংরেজরাই স্বাধীনতার জন্য বড় হুমকি। ১৬৯০ সালে বাণিজ্যের নামে সুতানটি গ্রাম ক্রয় করে ক্রমে ক্রমে তারা কলকাতা ও গোবিন্দপুরসহ নগরীর গোড়াপত্তন করে এবং সেখানে দুর্গ গড়ে তোলে। এরপর একদিকে মারাঠা শক্তি অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ দরবারের বিশ্বাস ঘাতকদের সাথে ইংরেজদের গোপন সম্পর্ক স্থাপনের পর ইংরেজদের মতিগতি সিরাজের কাছে ভাল ঠেকেনি। তিনি ইংরেজদের উৎখাত করার শপথ নেন। কিন্তু মীরজাফর আলী খাঁ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। মুর্শিদাবাদের মসনদের প্রতি তার লোভ ছিল। সিংহাসনের লোভে তিনি পাগল হয়ে উঠেন। তার সাথে যোগ দিলেন উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লব এবং আরো কয়েকজন।

এদিকে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সিরাজের খালাতো ভাই শওকত জঙ্গও নবাবকে মসনদ থেকে অপসারণের জন্যে গোপনে চেষ্টা করতে লাগলো।

১৭৫৭ সাল। পলাশী প্রান্তর। আচ্ছা দাদু তোমরা কি বলতে পারো পলাশী প্রান্তর কোথায় অবস্থিত? হ্যাঁ, তা হলে বলছি শোন। পলাশী প্রান্তর হলো নদীয়া জেলার কালিগঞ্জ থানায় অবস্থিত। সে দিন ছিল ২৩শে জুন। ক্লাইভের সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন নবাব। ষড়যন্ত্র মোতাবেক সিপাহশালার মীরজাফর আলী খাঁ সহ নবাবের হাজার হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে থাকলো। নবাব সিরাজ মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পারেন। সোচনীয় পরাজয় ঘটলো নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। বিশ্বাস ঘাতক মীরজাফরকে ইংরেজ ক্লাইভ বাংলার মসনদে বসালেন। কি নির্মম আচরণ দেখালেন মীর

www.phulkuri.org.bd

জাফর আলী খাঁ। যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এলেন সিরাজ। সিদ্ধান্ত নিলেন, এ অঞ্চল ত্যাগ করতে হবে।

দুঃসাহসী বাংলার হতভাগ্য নবাব সিরাজ বেগম লুৎফুন্নেসা, তাদের চার বছরের কন্যা জোহরা, একজন বিশ্বস্ত পরিচারিকা ও একজন ভৃত্যসহকারে রাতের অন্ধকারে রাজমহলের দিকে নৌকাযোগে তাঁর প্রাসাদ হীরাঝিল ত্যাগ করেন।

নবাব সিরাজের মুর্শিবাদ ত্যাগের সংবাদ ২৪ জুন সকালে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। নবাবকে বন্দী করার জন্য মীরজাফর চারদিকে লোক পাঠান এবং পুরস্কার ঘোষণা করেন।

এদিকে নৌকার মাঝিমাল্লাগণ অবিরাম নৌকা চালাতে গিয়ে ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ে। তারা নবাবের অনুমতি নিয়ে রাজমহল থেকে কয়েক মাইল দূরে নদী তীরের এক ভাঙ্গা প্রাসাদে রাত্রিযাপনের জন্য উপস্থিত হন। এই প্রাসাদে জনৈক দানিশ শাহ নবাবকে চিনতে পেরে অর্থলোভে মীরজাফরের সহোদর মীর দাউদকে সংবাদ দেয়।

১৭৫৭ সালের ২রা জুলাই নবাব সিরাজকে সপরিবারে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে আনা হয়। তখন ছিলো দুপুর বেলা। অগণিত প্রজা সাধারণ তাদের প্রাণপ্রিয় নবাবকে এক নজর দেখতে আসে। নবাব সিরাজকে মীরজাফরের পাপিষ্ট পুত্র মীর মিরণ জাফরগঞ্জ প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় রাখে। এই জাফরগঞ্জ প্রাসাদকে এখন বলা হয় নিমকহারাম দেউড়ি। এই প্রাসাদের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বন্দী করে রাখা হয় নবাব সিরাজকে। লর্ড ক্লাইভের পরামর্শে মীরজাফরের নির্দেশে বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

বলতে বলতে এক সময় দাদুর চোখ থেকে গড়িয়ে পানি পড়তে লাগলো। দাদু একনাগাড়ে বলে যাচ্ছেন। জানো দাদু, বয়সে তরুণ হলে কি হবে, সিরাজ ছিলেন গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী। এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। ঘাতক যখন তাকে হত্যা করতে উদ্যোত হয়, একটি মাত্র অনুরোধ ছিল তাঁর। প্রাণ ভিক্ষা নয় ওজু করে দু'রাকাত নামাজ আদায়ের সুযোগদানের অনুরোধ করে কিন্তু এ অনুরোধ রক্ষা করেনি ইংরেজের সেবাদাস নবাবের বেতনভূক্ত কর্মচারী ঘাতক। অবশেষে ৪ঠা জুলাই মিরণের আদেশে মোহাম্মদী বেগ নামীয় নবাব সিরাজের মাতামহীর পালিতা দাসীর স্বামী সিরাজের অসামান্য রূপ লাবণ্যময় দেহটি উপর্যুপরি তরবারির আঘাতে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তারপর সেই ছিন্নভিন্ন দেহ পরদিন সকালে হাতীর পিঠে চাপিয়ে বের হলো আনন্দ মিছিলে।

www.phulkuri.org.bd

নেতা মিরণ, চললো রাজপথ পরিভ্রমণে। হাতী সিরাজের বাসভবন। হীরাঝিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। সিরাজের মাতা আমিনা বেগম সিরাজের হত্যার সংবাদ পেয়ে রাজপথে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসেন। সে কি মর্মান্তিক দৃশ্য দাদু! কি নির্মম ইতিহাস।

পুত্রহারা আমিনা বেগমের কান্নায় আকাশ-বাতাশ শোকাহত ও ব্যথিত হয়ে ওঠে। তিনি হাতীর পিঠ থেকে নবাবের লাশ নামিয়ে চুম্বন করতে লাগলেন। মায়ের আহাজারি দেখে শববাহী হাতী চালকের নির্দেশ অমান্য করে সহসা রাজপথে বসে পড়লো। কিন্তু মিরণের নির্দেশে বিশ্বাসঘাতক খাদিম কিল, ঘুষি মেরে নবাবের কন্যা, স্ত্রী ও মা আমিনাকে জোর করে অন্দরমহলে পাঠিয়ে দিলো। এরপর সিরাজের দলিতমথিত লাশ বাজারের আবর্জনার স্তুপের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেলো।

সারাদিন সিরাজের লাশ পড়ে থাকলো মুর্শিদাবাদের বাজারের সেই ময়লার স্তুপের উপর। ভয়ে কেউ এগিয়ে এলো না লাশ দাফনের জন্য। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভাগীরথী যখন রূপার পাতের মত বয়ে যাচ্ছে, আতংকিত মানুষ নিজ নিজ গৃহে খুঁজে বেড়াচ্ছে নিরাপত্তা, সে সময় মির্জা জৈন-উল-আবেদিন অত্যন্ত যত্ন সহকারে বুকে তুলে নিলেন সিরাজের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। তারপর তাজিমের সাথে ধুয়ে মুছে নৌকায় তুলে ভাগীরথী পাড়ি দিয়ে চললেন খোশবাগে। এখানেই নানার কবরের পাশে সযত্নে মাটিতে শুইয়ে দিলেন বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে।

কোথাও সেদিন বিউগল বাজেনি প্রাচীন। কামানবাহী শকটে করে লাশ নেয়া হয়নি। শোক মিছিল হয়নি। হয়নি ৩১ বার তোপধ্বনি। লোকচক্ষুর আড়ালে একজন মানুষ মাটি দিয়ে ঢেকে দিলেন সিরাজের লাশ।

খোশবাগ বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডিকে বুকে নিয়ে সেই থেকে নীরব নিথর হয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সালেহা বললো, দাদু তারপর কি হলো? নবাবের বুঝি আর কেউ থাকলো না! দাদু চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, দাদু, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার জীবনাবসান ঘটিয়েও স্বস্থির হতে পারলেন না ষড়যন্ত্রকারীরা। বিশেষ করে ক্লাইভ চাইলেন সিরাজের বংশের সকলকে হত্যা করতে। তা না হলে একদিন প্রতিশোধ নিতে দাঁড়াবে এরা। ফলে মিরণের আদেশে বেগম শরফুন্নেসা, আমিনা বেগম, লুৎফুন্নিসা এবং একদা ষড়যন্ত্রকারিণী

www.phulkuri.org.bd

ঘসেটি বেগমকে প্রেরণ করা হলো ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদে। ঢাকার নায়েব নাজিম জসরত খান থাকলেন তার প্রহরায়। মিরণ হুকুম করলেন, সবাইকে হত্যা করতে। জসরত খান চাইলেন নবাবের নির্দেশ। নবাব মীরজাফর বললেন, সবাইকে মুর্শিদাবাদ পাঠাও। পথিমধ্যে বুড়িগঙ্গায় নৌকা ডুবিয়ে হত্যা করা হলো ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগমকে। পরে তাদের লাশ খোশবাগে আনা হয়। বাকি রইলেন সিরাজ ভ্রাতা মিরজা মেহেদী, লুৎফুনেসা এবং সিরাজ কন্যা উম্মে জোহরা।

সিরাজ-উদ-দৌলার মৃত্যুর সময় ভ্রাতা মেহেদীর বয়স মাত্র পনের বছর। তাকে পাথর চাপা দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল জাফরগঞ্জ প্রাসাদে। এবার তাকে হত্যার উদ্যোগ নিলো মিরণ। অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলো মিরজা মেহেদীকে। দুই পাশে দুটি তক্তা বেঁধে প্রচন্ড চাপ দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো তাঁকে। তারপর মিরজা মেহেদীর থেতলানো লাশ এনে কবর দেয়া হলো সিরাজের কবরের পাশে।

লুৎফুন্নিসা আত্মসমর্পণ করলেন না। তিনি চার বছরের শিশু কন্যা উম্মে জোহরাকে নিয়ে বেছে নিয়েছিলেন লাঞ্ছিত-অপমানিত কারাজীবন। আট বছর পর সিরাজের কবরের পাশে বসবাসের অনুমতি পেলেন লুৎফা। ১৭৬৫ সাল থেকে ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত ২১ বছর অনাহারে-অর্ধাহারে এখানেই কাটিয়েছেন তিনি। এভাবেই একদিন লুৎফিন্নেসাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো। স্বামী বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব রূপকথার নায়ক সিরাজউদ্দৌলার কবরের উপর।

দাদু আর নাতিদের কারো মুখে কথা নেই। সবাই নীরব হয়ে গেলো, কখন যে আমিরুল ও সালেহার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে টেরই পেলো না।

দাদু কম্পিত কণ্ঠে বললেন, সেদিনের সেই মুহাম্মদ-ইতিহাসে যাঁর পরিচিতি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলারূপে ঘাতকের অস্ত্রের আঘাতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। সেই তেসরা জুলাই থেকে আজ পর্যন্ত কতদিন, কত সপ্তাহ, মাস বছর, শতক মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলার ইতিহাসে আজও একটি নাম রূপকথার নায়কের মতো স্বাধীনতার মূর্তিমান উজ্জ্বল প্রতীকরূপে ভাস্বর হয়ে আছে। সে নাম সেদিনের বালক মীর্জা মুহাম্মদের, সে নাম বাংলার তরুণ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার।

www.phulkuri.org.bd

জমিদার হাসন রাজা

সুনামগঞ্জের এক নিভৃত পল্লীগ্রামে জ্যোৎস্নায় আলোকিত শিশির ঝরা এক রাতে চাঁদের মতো ফুটফুটে একটি শিশু জন্ম নেয়। তাঁর পিতার নাম আলী রাজা ও মাতার নাম জাহান বিবি। সেদিনটি ছিলো ১২৬১ বাংলা সনের ৭ পৌষ। নাম রাখা হলো তাঁর হাসন। হাসন অর্থ কি জানো? হাসন অর্থ সুন্দর। সত্যিই এই নামেই যে মানায় তাঁকে।

বড় ভাই ওবায়দুররাজা তাঁর নাম রাখলেন অহিদুররাজা। আর সিলেটের তখনকার ফারসি ভাষার পন্ডিত নাজির আবদুল্লাহ শিশুটির নাম রাখলেন হাসন রাজা। ছেলেবেলায় এ দু'টো নামেই ডাকা হতো তাঁকে। কৈশোর কেটে যাওয়ার পর তিনি হাসনরাজা নামেই পরিচিত হতে লাগলেন।

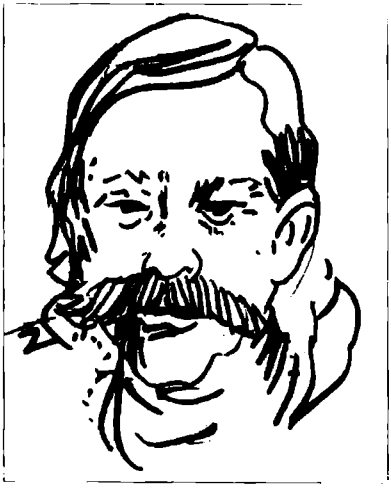

তখনকার দিনে সিলেটের জমিদারদের মধ্যে হাসনের পিতা আলী রাজা ষষ্ঠ স্থানে ছিলেন। হাসনের বড় ভাই ওয়াহিদুর রাজা মাত্র তিনদিনের জ্বরে মারা যান। তাঁর চল্লিশ দিনের মধ্যে পিতা দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরীও ইন্তেকাল করেন। পিতৃহারা হাসনকে ঘিরে রাখল তাঁর মমতাময়ী মায়ের স্নেহ। তাঁর সকল

www.phulkuri.org.bd

আবদার, সকল আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু মা। মায়ের নয়নের মণি হাসনের লেখাপড়া হলো বংশের রীতি অনুযায়ী। মৌলবী সাহেবের কাছে তিনি কুরআন শরিফ ও বোগদাদি কায়দা এবং হিন্দু পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে বাংলা ব্যাকরণের পাঠ নেন।

ছেলেবেলায় গ্রামের অপর দশটি বালকের সঙ্গে দুষ্টুমিতে মেতে থাকতেন তিনি। কখনো হাডুডু বা কাবাডি খেলেছেন। কখনো নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতেন, আবার কখনো বা নদীর তীরে প্রশস্ত বটগাছের এ ডাল থেকে ও ডালে লাফালাফি করেছেন। বাড়িতে শাসন করার মত কেউ নেই। তাই সারাদিন খেলায় মেতে থাকলেও এই প্রাণের আবেগে টগবগ দুরন্ত শিশুটিকে কারো বকুনি খেতে হতো না।

ধীরে ধীরে শৈশব কেটে গিয়ে কৈশোর এলো, আর কৈশোর কেটে যাওয়ার আগেই পিতাকে হারালেন। যার কারণে শিশুটির স্বভাব থেকে দুরন্তপনা ও চঞ্চলতা কেমন করে যেন হারিয়ে গেল। পরিণত মনের মানুষ হয়ে উঠতে লাগলেন তিনি।

অবসর সময়ে হাওরের অতল পানি আর আকাশের সীমাহীন নীলের দিকে তাকিয়ে থাকেন হাসন। দেখেন, সাদা বলাকার ঝাঁক আকাশে উড়ে যাচ্ছে। দেখেন, বিলের পানি আলো করে ফুটে আছে লাল শাপলা।

কিশোর বয়সে বাবাকে হারিয়ে ফেলার কারণে সংসারের অনেক দায়িত্ব আসতে লাগল হাসনের ওপর। জমিদারির দেখাশোনা, প্রজাদের সুখ-সুবিধার দিকে খেয়াল, মামলা-মোকদ্দমার তদারকি, এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো তাঁকে।

হাসনরাজা ছিলেন সত্যের সাধনায় নিবেদিত এক সাধক পুরুষ। তাঁর অন্তরে ছিল এক আকুতি। যিনি স্রষ্টা, যিনি সকল জগতের প্রভু, তাঁর স্বরূপ জানার জন্য আকুতি। আর এই আকুতি থেকেই জন্ম নিলো কবি হাসন। মরমি কবি হাসন, সুফি কবি হাসন। তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সহজ সরল ও সাবলীল ভাষায় সৃষ্টি করেছেন একের পর এক কবিতা ও গান-

"মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দী
হইয়ারে
কান্দে হাসন রাজার মন মুনিয়ারে
মায়ে বাপে বন্দী হইল খুশিরও
মাঝারে
লালে ধলায় বন্দী হইলাম
পিঞ্জিরার মাঝারে।"

www.phulkuri.org.bd

প্রার্থনার ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত ধারণা থেকে একটু দূরে সরে গেছেন। তিনি জগৎকে এক বিস্তৃত মহাসাগররূপে কল্পনা করেছেনঃ

" আল্লা ভবসমদুরে ও আল্লা
ভবসমদুরে
তরাইয়া লও মোরে
তরান বরান চাই না আমি কেবল
চাই তোমারে।"

এই ধরনের সুন্দর-সুন্দর গান নিয়ে লেখা বই "হাসন উদাস' ১৯১২ সালে সিলেটের রহমানিয়া প্রেস প্রকাশ করে।

আবিদ আলী নামে এক খানসামা সব সময় হাসনরাজার সাথে থাকতেন। তিনি হাসনরাজার মাথার ওপর হলুদ সিল্কের ঝালর দেওয়া রাজকীয় কারুকার্যময় ছাতা ধরে রাখতেন।

পাড়ার সকল লোকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল খুব মধুর। তিনি প্রতিবেশীদের খোঁজ-খবর নিতেন সব সময়। যে কোনো বিপদ-আপদে পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। তাঁর উদার ও সুন্দর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হতেন।

একবারের একটি চমৎকার ঘটনা বলছি তোমাদের। এটি শুনলে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে তোমাদের আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হবে। হাসনরাজা লক্ষ্মণশ্রী থেকে রামপাশা যাচ্ছেন। রামপাশা ও লক্ষ্মণশ্রী গ্রাম দুটোর মধ্যে দূরত্ব প্রায় তিরিশ মাইল। তিনি শীতকালে ও বসন্তকালে লক্ষ্মণশ্রী থেকে রামপাশা যেতেন পাল্কিতে চড়ে। তাঁর পাল্কি ছিল বড় সুন্দর। এটি ছয়ফুট লম্বা। ভেতরে রয়েছে নরম গদি ও তাকিয়া। আটজন বেহারা পালাক্রমে এটি বহন করতো। ফাল্গুন মাস। সকালে তিনি রওয়ানা হলেন। বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় রামপাশার কাছেই বন্দরগাঁও পৌঁছে গেলেন। সারাদিনের ভ্রমণে কিছুটা ক্লান্ত হাসনরাজার তৃষ্ণাও পেয়েছে। তিনি বেহারাদের আদেশ দিলেন, চন্দরগাঁওয়ের সোহাগ রায় চৌধুরীর বাড়ির কাছে পাল্কি থামাতে। ইতোমধ্যে খবর পেয়ে সোহাগ চৌধুরী অন্দরমহল থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে হাসন রাজাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। হাসনরাজা এক গ্লাস পানি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্দরে লোক চলে গেল পানি আনতে। সোহাগ চৌধুরীও ভেতরে গেলেন তার সঙ্গে।

পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, আধ ঘন্টা গেল, এক ঘন্টা যাওয়ার পথে, পানির দেখা নেই। হাসনরাজা বিরক্ত হচ্ছেন তবুও বসে আছেন ভদ্রতার খাতিরে।

www.phulkuri.org.bd

প্রায় ঘন্টা দেড়েক পর সোহাগ রায় একটি কাঁচের গ্লাসে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পানি নিয়ে এসে বললেন, মাফ করবেন বড় দেরি হয়ে গেল। আমাদের পুকুরের জল জ্বাল দিয়ে খাই বলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। গাঁয়ে ভাল পুকুরও নেই। তাই একজন লোককে পাঠিয়ে পাশের আতাপুর গ্রাম থেকে জল আনলাম।

হাসনরাজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনাদের গাঁয়ে আর একটিও ভাল পুকুর নেই? সোহাগ রায় জবাব দিলেন, না, ভাল জলের কোন পুকুর গ্রামে নেই।

হাসনরাজা বললেন, আমি আপনাদের বৈঠকখানায় বসলাম। আপনাদের এই পুকুরটাকে আবার কাটিয়ে পরিষ্কার করে তার পানি খেয়ে তবেই রামপাশায় যাব। যা তো উদাই, রামপাশায় গিয়ে সব লোককে বল, যেন তারা প্রত্যেকে কোদাল নিয়ে আসে।

পরদিন এই মজা পুকুরের পানি বের করে দেওয়া হলো, মাটি কাটা শুরু হলো। প্রায় ৫শ লোক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম মাটি খুঁড়ছে। হঠাৎ স্বচ্ছ পানি উঠতে লাগলো। সোহাগ রায় হাসনরাজার জন্যে নিজ হাতে এক গ্লাস পানি তাঁকে পান করতে দিলেন। পানি খেয়েই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে হাসনরাজা বললেন, আমার কাজ শেষ হয়েছে। এবার আমি রামপাশা চললাম।

হাসনরাজা ছিলেন কাজের মানুষ। তাঁর মধ্যে ছিল নানা ধরনের ব্যক্তিত্বের সমাবেশ। তিনি একজন সৌখিন জমিদার, একজন দয়ালু দাতা, একজন কবি ও দার্শনিক, একজন প্রকৃতিপ্রেমিক ও একজন আল্লাহভক্ত লোক ছিলেন। বড় লাটের দরবারে যেতেন মহারাজার মতো জমকালো পোশাক পরে। আবার নৌকোবাসী গাঁয়ের সমাজের মধ্যে তাদেরই মতো সাদাসিধা কাপড় পরে হাসিঠাট্টা করতেন। তিনি হেকিমী চিকিৎসা জানতেন। তাঁর লেখা "সৌখিন বাহার" বইতে নানা পশুপাখির সঙেগ মানব চরিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। দিবা-রাত্রি তিনি দু'হাতে দান করে বেড়াতেন। হাসনরাজার চার পুত্র ছিলেন। আর মেয়ের সংখ্যাও ছিল চার। পুত্র-কন্যা, নাতি নাতনীদের তিনি ভালবাসতেন।

এই অনন্য প্রকৃতির দয়াবান মানুষটি ১৩২৯ বাংলা সনের অগ্রহায়ণ মাসে রাত্রিকালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে বিভিন্ন জায়গা থেকে শত শত লোক ছুটে আসেন বিলাপ করতে করতে। অনাথ গরিবেরা দলে দলে এসে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, দয়াল কই গেলায় বাবা।

তোমরা ছোট্ট বন্ধুরা যখন বড় হবে, তখন হাসনরাজার লেখা পড়ে, তাঁর গান গেয়ে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবে এই সাধক মানুষটির ব্যক্তিসত্তাকে।

www.phulkuri.org.bd

মহীশুরের ব্যাঘ্র টিপু সুলতান

তোমরা তো কিছুদিন আগেও টিভির পর্দায় একটি সিরিয়াল নাটক দেখেছিলে। যে নাটক পাক-ভারত উপমহাদেশের ঘরে ঘরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই নাটক মুসলিম জাতিকে পুনরায় জাগিয়ে তুলেছে। যে মহানায়ককে নিয়ে এই নাটকটি রচিত তিনি হলেন, শেরে মহীশুর বা মহীশুর ব্যাঘ্র টিপু সুলতান। বিদেশী আগ্রাসী শক্তির ছোবল থেকে নিজ জাতি ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় যে আপোষহীন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের নজির তিনি রেখে গেছেন, শত শত বছর পরেও দুনিয়ার মানুষের কাছে বিরল নজির হিসাবে তা এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। পর-রাজ্য লোভী বিদেশী শক্তির হামলার মোকাবিলায় দেশ ও জাতির মান মর্যাদা আর স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ে অকুতোভয় মহীশুর-ব্যাঘ্রের প্রচন্ড হুঙ্কার আজও যেন আমরা কান পাতলে শুনতে পাই। তাঁর আপোষহীন ও সংগ্রামী জীবন আজও আমাদেরকে দেশ ও জাতি গঠনে প্রেরণা ও সাহস যোগায়।

পলাশীতে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের সাথী ছিল উমিচাঁদ, জগতশেঠ। তাদের ষড়যন্ত্রের টোপ গিলেছিলেন সেনাপতি মীরজাফর। সেরিঙ্গাপত্তমেও ইংরেজরা একইভাবে সফল হয়। অর্থমন্ত্রী পূর্ণিয়া

www.phulkuri.org.bd

তাদের দলে যোগ দেয়।

সেরিঙ্গাপত্তম দূর্গের পতন হয় ১৭৯৯ সালে। তারিখ ৪ঠা মে। ষড়যন্ত্রের কারণে মাত্র কয়েক ঘন্টায় মহীশুর রাজ্যের ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে আসে। ইতিহাসে সেই এক কালো দিন। সে দিনে সমগ্র ভারতে ইংরেজদের দখল প্রতিষ্ঠার বাধা দূর হয়।

সেরিঙ্গাপত্তম দুর্গের প্রাচীরগুলি দখল করলো ইংরেজরা। এবারে সুলতানকে বন্দী করার লক্ষ্যে ছুটলো তারা। সুলতানকে বন্দী করতে না পারলে তাদের এ বিজয় নির্ঘাত আবার পরাজয়ে পরিণত হবে।

বিশাল মহীশুর রাজ্যের 'বিখ্যাত সুলতান ভারতের আযাদী রক্ষার সংগ্রামের মহান সেনাপতি। ইংরেজ বাহিনীর ত্রাস। দক্ষিণ ভারতের জনগণনন্দিত নায়ক এই কিংবদন্তীর মানুষটির শেষ পরিণতি দেখার উত্তেজনা তাদের চোখে মুখে। ইংরেজদের আঘাতের পর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয় সুলতানের বাহিনী।

অগণিত লাশ আর আহত মানুষের স্তুপে আকীর্ণ একটি স্থান। সেখানে আহত অবস্থায় পড়ে আছেন রেজা খান। তিনি সুলতানের নিকটাত্মীয়। ঘনিষ্ঠ সহচর। তার আঘাত মারাত্মক।

রেজা খান কাছেই একটি জায়গার দিকে ইশারা করলেন। সেখানেই পড়ে আছে মহীশুর সুলতানের লাশ। ভারতের সৌভাগ্য সূর্য ফতেহ আলী টিপু সুলতান।

ফটকের তলা থেকে সুলতানকে যখন নিয়ে আসা হয়, তখনো তাঁর চোখ দু'টি খোলা ছিল। তাঁর শরীর ছিল উষ্ণ। সুলতানের মাথায় কোন আবরণ ছিল না। তিনি পড়ে যাওয়ার সময় পাগড়িটি কোথায়ও হারিয়ে গিয়ে থাকবে। সুলতানের বাহুতে বাঁধা ছিল একটি মাদুলী। কিন্তু কোন অলংকার ছিল না। তাঁর চেহারায় ছিল মর্যাদার প্রতীক, যে চেহারায় বীরত্ব ব্যাঞ্জক দৃঢ়তা। সেই দৃঢ় সংকল্পের ছাপ তাঁকে সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছিল।

সুলতান আঘাত পেয়েছিলেন চারটি। তিনটি আঘাত ছিল শরীরের বিভিন্ন অংশে। আর একটি ছিল কপালের পাশে। গুলীটি প্রবেশ করেছিল কানের সামান্য উপর দিয়ে। আর তা আটকে ছিল চিবুকের ভিতর।

'টিপু সুলতানের শাহাদাতের প্রায় দু'শ বছর পর আজো আমরা তাঁর অমর আত্মদানের কথা স্মরণ করি। আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে অনুপ্রেরণা পাই। ১৮৫৭ সালে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ও এই বীরের কবরের পাশে গিয়ে সংগ্রামী মানুষেরা শপথে বলিয়ান হয়েছেন। আগামী দিনেও তার কোরবানী আমাদের পথ দেখাবে।

আর যারা বিশ্বাসঘাতক, তারা ইতিহাসের কাঠগড়ায় আসামী হয়েই থাকবে চিরকাল। আজো যারা সেরিঙ্গাপত্তনে যান, ঘৃণার সাথে পাথর নিক্ষেপ করেন সে স্থানটিতে। যেখানে দেশপ্রেমিক সৈন্যরা হত্যা করেছিল বিশ্বাসঘাতক মীর সাদিককে।

www.phulkuri.org.bd

জিন্দাপীর আওরঙ্গজেব

সেই কতদিন আগের কথা। তখন রাজা ছিল, বাদশা ছিল, ছিল উযির-নাযির, সিপাই-মন্ত্রী। আরো কত কি।

সেই সব রাজা-বাদশার আবার নানান রকম খেয়াল থাকতো। তাদের আনন্দদানের জন্য থাকতো নানান ধরনের খেলার আয়োজন। এমন ধরনের খেলা ছিল হাতীর লড়াই।

তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এ আবার কেমন খেলা তাই না? হ্যাঁ বন্ধু, হাতীর লড়াই। দুই প্রকাণ্ড হাতীকে লাগিয়ে দেয়া হতো লড়াইয়ে। একটা আরেকটাকে দেখে রেগে যেতো, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়তো অন্যটির উপর।

প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর আগে এমনি এক হাতীর লড়াই হয়েছিল যমুনা নদীর তীরে আগ্রার দুর্গের প্রাঙ্গণে।

রাজা এসে বসলেন বারান্দায় হাতীর লড়াই দেখার জন্য। সঙ্গে তার উযির-নাযির। ওই রাজার কয় ছেলে জানো? চার ছেলে। ওরাও লড়াই দেখবে। তবে বসে নয় ঘোড়ায় চড়ে তারা হাতীর লড়াই দেখবে।

তখন এসব হাতীর নাম দেয়া হতো। এ হাতীদের মধ্যে একটির নাম সুধাকর আর অন্যটির নাম সুরতসুন্দর।

www.phulkuri.org.bd

লড়াই শুরু হয়ে গেলো।

খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মজা দেখছে সম্রাট। অনেক্ষণ ধরে চলল সেই দুই হাতীর যুদ্ধ। তারপর সুধাকর হাতীর আক্রমণে সুরতসুন্দর পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলো। এদিকে সুধাকরের রাগ মাত্র উঠেছে। তখন সে কি করলো?

দারুণ রঙচঙা পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে মজা দেখা চার রাজপুত্রের দিকে ছুটলো। তেড়ে গেল ভয়ঙ্কর দাঁত উচিয়ে। পাগলা হাতী রাজপুত্রদের আক্রমণ করে বসলো। তখন রাজা বারান্দায় বসে সব দেখছিলেন।

ভয়ে অস্থির হয়ে গেলো সমস্ত পরিষদ, সিপাহীসান্ত্রী, উযির-কোতয়াল। রুদ্ধশ্বাসে তারা দেখতে লাগলো। তারপর কি হলো?

প্রাণের ভয়ে রাজপুত্ররা যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেল। তবে কি চারজনই পালালো? না বন্ধু। তিনজন তিন দিকে পালিয়ে গেলো। আর একজন ঘোড়ার পিঠে বসে স্থির হয়ে হাতীকে অবলোকন করছেন। তাঁর ঘোড়াটাও পালানোর জন্য তড়বড় করছিল। হ্রেষা রবে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। রাজপুত্র শক্ত করে লাগাম ধরলেন। ঘোড়াটিকে পালাতে দিলেন না। হাতীটির অবস্থা দেখে তিনিও খেপে গেলেন। মনে মনে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিলেন।

রাজপুত্রের দিকে তেড়ে আসলো হাতীটি। রাজপুত্র প্রচণ্ড বেগে নিক্ষেপ করলো বর্শা। বর্শা গিয়ে বিদ্ধ হলো সুধাকরের কপালে। ক্ষেপে গেলো সুধাকর।

সে পাল্টা আক্রমণ করলো রাজপুত্রকে।

রাজপুত্রের ঘোড়া হাতীর আক্রমণে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল। ছিটকে পড়লো রাজপুত্র। কিন্তু সাহস হারালো না। চোখের পলকে হাতে তুলে নিলো বর্শাটি। হাতীটিও এগিয়ে আসছে। রাজপুত্র বর্শা তাক করলো হাতীটির দিকে।

স্তম্ভিত হয়ে দেখছেন বাদশাহ্। ধেয়ে আসছে সুধাকর রাজপুত্রের দিকে। ব্যালকনি থেকে নেমে এলেন বাদশাহ্। হঠাৎ কোত্থেকে পালানো হাতী সুরতসুন্দর দ্বিগুণ তেজে হাজির হয়ে আচমকা তেড়ে গেল সুধাকরের দিকে। সুধাকর তখন ভয়ে পালিয়ে গেলো। সাহসী রাজপুত্র বেঁচে গেলেন। চারদিকে রব উঠলো। রাজপুত্রের সাহস দেখে সবাই বাহবা দিতে লাগলেন।

তারপর পিতার কাছে এগিয়ে এলেন পুত্র। জড়িয়ে ধরলেন পুত্রকে পিতা। এই বীরত্বে অভিভূত হলেন সম্রাট। ভীষণ খুশি তিনি। রাজপুত্রকে পুরস্কার হিসাবে কি দিলেন জানো? সম্রাট তাকে পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিলেন। সম্রাট বললেন, হাতের কাছে যা পেলাম তাই তোমাকে দিলাম। আমার ইচ্ছা হয় গোটা সাম্রাজ্যটা তোমার হাতে তুলে দেই। তবে এ জন্য অনেক বড় পুরস্কার পাবে।

www.phulkuri.org.bd

কি বন্ধু, তোমাদের কাছে রূপকথা মনে হচ্ছে। না রূপকথা নয়। এ সত্যি সত্যি ঘটনা। এই বীরপুরুষ রাজপুত্রের নাম শাহজাদা আওরঙ্গজেব। তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। আর তার পিতার নাম? তিনি হলেন খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাতীর লড়াই দেখা মোঘল সম্রাট শাহজাহান স্বয়ং। এই ঘটনাটি ঘটেছিলো ১৬৩৩ খৃস্টাব্দের ২৮ মে, যমুনা নদীর তীরে। আগ্রা দুর্গের প্রাঙ্গণে।

আওরঙ্গজেব জন্মগ্রহণ করেন ১৬১৮ খৃষ্টাব্দের ২৪ অক্টোবর। খুব সাহসী এ মানুষটি ভারতের মতো বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি। কতো তাঁর উযির-নাযির সিপাই-মন্ত্রী। কিন্তু তিনি জীবনযাপন করতেন সাধারণ মানুষের মতো, ফকির দরবেশের মতো। তিনি ছিলেন আল্লাহপ্রেমিক। ধর্মের প্রতি অসীম অনুরাগের জন্যে সবাই তাঁকে নাম দিয়েছিলেন আওরঙ্গজেব। এর অর্থ কি জানো? অর্থ হলো জিন্দাপীর।

১৭০৭ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার যখন তিনি ইন্তেকাল করেন তখনো তাঁর হাতে ছিলো তসবিহ, আর মুখে কলেমা। গোটা পাকভারত উপমহাদেশের মতো এত বিশাল মোঘল সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়েও তাঁর মধ্যে কোন অহঙ্কার ছিলো না। তিনি ছিলেন নিরহংকারী সম্রাট জিন্দাপীর আওরঙ্গজেব।

---

www.phulkuri.org.bd

মসনদ-ই-আলা ঈশা খাঁ

ষোড়শ শতাব্দীর কথা। বাংলা প্রদেশ। এর পূর্বাঞ্চল ছিল দুঃসাহসী এবং রোমান্টিক কার্যকলাপের আবাসস্থল। এ অঞ্চলে তখন আফগান, মগ, পর্তুগীজগণ অবাধ বিচরণ করতে পারত। ইসলাম শাহের রাজত্বকালে (১৫৪৫-৫৩) একজন দুঃসাহসী সংগ্রামী বীর বাংলায় আগমন করেন। তার নাম কালিদাস গজদানী। তিনি বৈশ্য রাজপুত বংশদ্ভুত ছিলেন। এক সময় কালিদাস গজদানী মুসলমান হয়ে যান। মুসলমান হলে তাঁর নাম হয় সোলায়মান খাঁন। তিনি ঢাকা ও মোমেনশাহীর উত্তর পূর্ব অংশে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এক সময় কালিদাস ভাগ্যান্বেষণে গৌড়ে আগমন করেন এবং সৈয়দ সুলতানের রাজস্ব বিভাগে চাকরি লাভ করেন। প্রতিভা বলে তিনি রাজস্ব উজিরের পদে অধিষ্ঠিত হন।

সোলায়মান খাঁ বাংলার সৈয়দ বংশের শেষ শাসক সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর নাম ছিলো সৈয়দা মোমিনা খাতুন। ১৫৪৫ সালে সোলায়মান খাঁ শেরশাহের পুত্র ইসলাম শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে তাঁকে ইসলাম শাহের দু'জন সেনাপতি তাজখান ও দরিয়া খান

www.phulkuri.org.bd

যুদ্ধকালীন অবস্থায় সন্ধির জন্য আলোচনার কথা বলে কৌশলে ধরে ফেলেন এবং তাঁকে হত্যা করেন। ঐ সময় তাঁর দুই পুত্র ঈশা খাঁ ও ইসমাইল খাঁ আফগানদের হাতে বন্দী হন।

তারপর ঈশা খাঁ ও তার ভাই ইসমাইল খাঁকে তুরস্কের একদল বণিকের নিকট দাসরূপে বিক্রি করে দেয়া হয়। এই সময় চাচা কুতুব খাঁ নওয়াব তাজখাঁর অনুগ্রহ লাভ করেন এবং উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হন। বহু অনুসন্ধানের পর চাচা কুতুব খাঁ সুদূর তুরান দেশের কোন এক ধনাঢ্য গৃহে তাদের সন্ধান প্রাপ্ত হয়ে প্রচুর অর্থ প্রদানপূর্বক তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে তথা হতে মুক্ত করে আনয়ন করেন। তখন ঈশা খাঁ দীর্ঘ ১৬ বছর তুরস্কে অবস্থান করেছিলেন।

ঈশা খাঁর বয়স যখন ১৭ বছর তখন তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের সেনাপতি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এর মধ্যে তিনি অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবশেষে ১৫৮১ সালের শেষের দিকে ঈশা খাঁ সমগ্র ভাটী রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে নিজেকে ঘোষণা দেন। তার পর সরাইল থেকে তাঁর শাসনকেন্দ্র সোনারগাঁওয়ের নিকট কাতরাবোতে স্থানান্তর পরে সেখানেই তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। কলাগাছিয়া খিজিরপুরে দুর্গ তৈরী করলেন এবং এগারসিন্ধুরে প্রাচীন সামন্ত রাজাদের নির্মিত দুর্গটি সংস্কার করে একটি সেনা ছাউনি নির্মাণ করলেন। হোসেনপুর, বোকাইনগরসহ বেশ কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলেন।

তোমরা হয়তো ঈশা খাঁ আর মানসিংহের যুদ্ধের কথা শুনেছ। ১৫৯৪ খৃঃ ১৭ মার্চ জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবরের পুত্র যুবরাজ সেলিমের নির্দেশে রাজা মানসিংহ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। রাজা মানসিংহ বাংলায় আসার সময় তার পুত্র দুর্জয় সিংহ, হিম্মত সিংহ, জগত সিংহ ও রাজা রাম চন্দ্র দেব ও বেশ কিছু সংখ্যক মোঘল আমত্য বাংলায় আগমন করেন। ১৫৯৬ খৃঃ জুলাই মাসে রাজা মানসিংহ শেরপুর থেকে রংপুরের ঘোড়াঘাটে এসে অবস্থান নেয়। ঐ সময় তিনি হঠাৎ করে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ফলে চিকিৎসকরা তার জীবন সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন।

ঈশা খাঁর নিকট এই সংবাদ পৌছার পর মাসুদ খান ও বীর করিমের নেতৃত্বে এক বিশাল নৌবহর মোঘল সৈন্যদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য অতিদ্রুত তাদের অবস্থানের ২৪ মাইলের মধ্যে গিয়ে পৌছেন। ঐ সময় ঈশা খাঁর বাহিনীকে প্রতিরোধ করার মত সামরিক শক্তি মোঘলদের ছিলো না। ফলে ঈশা খাঁর সৈন্যদের আক্রমণে রাজা মানসিংহের বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। যুদ্ধে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক

www.phulkuri.org.bd

মোঘল সৈন্য নিহত হয়।

রাজা মানসিংহ তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতিদ্রুত সোনারগাঁয়ের দিকে যাত্রা করলেন। ঈশা খাঁ সন্ধি করতে চাইলেন কিন্তু মানসিংহ তা প্রত্যাখ্যান করে শীতলক্ষ্মার তীরে একডালা দুর্গের দিকে অগ্রসর হলেন। এ সংবাদ পেয়ে ঈশা খাঁ এগার সিন্ধুরে চলে এলেন। মানসিংহও ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত ঈশা খাঁর দুর্গের কাছে চলে এলেন। যুদ্ধ শুরু হলো। সাতদিন ধরে অবিরাম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। রাত নেমে এলো । পরদিন আবার যুদ্ধ হবে।

এই রক্ত ক্ষয় বন্ধ করার জন্য ঈশা খাঁ এক দুত মারফত মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। রাজপুত্র সেনাপতি সে আহ্বান গ্রহণ করলেন। কিন্তু মানসিংহ যুদ্ধে নিজে অবতীর্ণ না হয়ে তার জামাতাকে প্রেরণ করলেন। মানসিংহের জামাতা ধরাশায়ী হয়ে প্রাণ হারান।

এবার রাজপুত্র সেনাপতি ঈশাখাঁর সাথে যুদ্ধে নামলেন। প্রথমে অশ্বপৃষ্ঠে দুই বীরের মধ্যে চললো লড়াই। কিন্তু মানসিংহ তার অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গেলেন। এমতাবস্থায় ঈশা খাঁ রাজা মানসিংহকে আঘাত না করে তাকে মাটি থেকে হাত ধরে তুলে নিলেন। অতঃপর মানসিংহ কৃতজ্ঞ চিত্তে ঈশা খাঁর দিকে বন্ধুত্বের হাত সম্প্রসারিত করলেন।

১৫৬৩ খৃঃ ভাটী বাংলার অধিশ্বর হিসেবে ঈশা খাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটার পর দীর্ঘ ৩৬ বছরের দুর্জয় সংগ্রামী জীবনে তিনি প্রায় সমগ্র পূর্ব বাংলার মহান রাজ্য নায়ক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অসামান্য রণকৌশল অসাধারণ প্রজ্ঞা ও সাহসিকতার ফলে সম্রাট আকবরের প্রায় প্রতিটি সামরিক অভিযান ব্যর্থ হয়েছিলো ঈশা খাঁর দুর্জয় প্রতিরোধের মুখে।

দীর্ঘদিন যাবত মোঘলদের সাথে তাঁর অবিরাম যুদ্ধের ফলে জীবনের উচ্ছলতায় কিছু ভাটা পড়ে গেল। ফলে তার পুত্র মুসাখাঁকে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দেন এবং তাঁকে মসনদ-ই-আলা উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৫৯৯ খৃঃ মাঝামাঝি সময় ঈশাখাঁ কিছুদিনের বিশ্রামের জন্য সোনারগাঁও থেকে মহেশ্বরদী পরগনা বর্তমান গাজীপুরের কালীগঞ্জের নিকট বক্তারপুর দুর্গের প্রাসাদ বাটিতে গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। চিকিৎসকরা অবিরাম চেষ্টা করেও তাঁকে সুস্থ করে তুলতে ব্যর্থ হন। অবশেষে ১৫৯৯ খৃস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর ঈশা খাঁ মৃত্যুবরণ করেন। বক্তারপুরেই বাংলার এই মহান বীরের সমাধী অবস্থিত।

www.phulkuri.org.bd

তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা

আমাকে মারবেন না হুজুর, আমাকে মারবেন না। নীল কুঠিয়ালদের চাবুকের আঘাতে চিৎকার দিয়ে কাঁদছে এক চাষী। চাবুকের ঘা দিচ্ছে আর বলছে, নীলের চাষ করবি কিনা বল। কোম্পানীর তল্পী বাহক নতুন জমিদাররাও অত্যাচার করছে। খাজনা আদায়ের নামে চাষীদের গরু ছাগল কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এমনকি কৃষকের জমিও নিলাম করে নিচ্ছে। এসব জমিদারের সবাই ছিল বর্ণবাদী হিন্দু জমিদার। পূজা-পার্বনের খরচ যোগাতে হতো মুসলমানদের। পূজা-পার্বনে ক্রীতদাসের মত খেটে দিতে হতো তাদের সবাইকে।

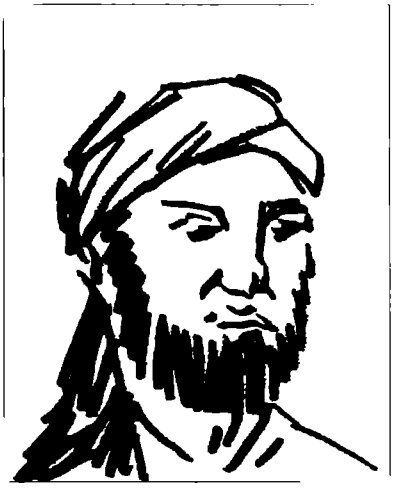

মুসলমান প্রজাদের নাম হবে বেঙ্গা, বোন্দা, গেন্দা, বুটা, জরু, হারু কিংবা মেমা। হাবলা কিংবা পঁচা। মেয়েদের নাম হবে চান্দী, গেন্দী, হাদানী, পচি, কুড়ানী, পেন্দী বা পুটি। এসব নাম বদল করে আরবী বা মুসলমানী নাম রাখলে প্রত্যেক নামের জন্য দিতে হতো পঞ্চাশ টাকা "খারিজানা" খাজনা।

যারা দাঁড়ি রাখবে, প্রত্যেক দাঁড়ির জন্য দিতে হতো আড়াই টাকা খাজনা। গোঁফ ছোট করলে দিতে হবে পাঁচশিকা।

মসজিদ তৈরী করলে প্রত্যেক কাঁচা

www.phulkuri.org.bd

মসজিদের জন্যে পাঁচ টাকা আর পাকা মসজিদের জন্য জমিদারকে দিতে হতো এক হাজার টাকা নজরানা। গরু জবাই করলে শাস্তি হিসাবে তার ডান হাত কেটে দেয়া হতো।

আরো আছে একুশ টাকা খাজনা ডাক খরচা, ভিখ খরচা, পার্বনী, তহুরী, বিবাহ কর, রথ খরচা, বরদারী খরচা, আয়কর, বনসেলামী, খরিজ দাখিল নজরানা, অঞ্জরী সেলামী, নাপিতকর, জমিদার বাড়ির ভোজকর, সন্তান হলে তার জন্যও কর দিতে হতো। আরো কতকি। এছাড়াও ছিল বিনা পয়সায় যখন তখন জমিদার বাড়িতে গতর খাটুনী। উপরের এসব ছিল জমিদারের হুকুম। জমিদার কৃষ্ণদেবের আইন।

এ হুকুমের নড়চড় নেই। পালন না করলে চাবুকের আঘাতে প্রজার রক্তমাখা শরীর মাটিতে গড়াতো, ভিটেমাটি নিলাম হয়ে যেতো। গরু-ছাগল কেড়ে নেয়া হতো।

১১৮৮ সালের ১৪ মাঘ। বাংলার মুসলমানদের এই দুর্দিনে জন্ম নিলো একটি শিশু। নাম তার মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। চব্বিশ পরগানা জেলার চাঁদ গ্রাম। এই গ্রামের মীর হাসান আলীর ঘরেই জন্ম হলো তিতুমীরের। মাতার নাম আবেদা রোকেয়া খাতুন।

শিশু তিতু পিতা-মাতার আদরে দিন দিন বড় হতে লাগলো। একে একে তাঁর জীবনের চারটি বছর গত হয়ে গেল। লেখাপড়ার প্রতি তাঁর খুব ঝোঁক। মাত্র সাড়ে চারবছর বয়সে বাবা তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে মাদ্রাসায় নিয়ে গেলেন।

আঠার বছর বয়সে তিনি আরবী, ফারসী, বাংলা, অংকশাস্ত্রে সুপন্ডিত হয়ে উঠেন।

নীল কুঠিয়ালদের অত্যাচার দেখে তিতুর খুব দুঃখ হলো। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, নীল কুঠিয়ালদের রুখে দাঁড়াতে হবে। তাদের অত্যাচার থেকে গরীব চাষীদের বাঁচাতে হবে। এ কারণে তিনি লেখাপড়া শেষ করে ওস্তাদ হাফিজ নেয়ামত উল্লার কাছে শরীর চর্চা শুরু করেন। তিনি শিখেন কুস্তি, লাঠিখেলা, তলোয়ার ও ঢাল-সড়কির খেলা।

যথা সময়ে তিনি বিয়ে করলেন। কিন্তু তাঁর জীবনে সুখ সইলো না। বিয়ের মাত্র চৌদ্দদিন পর বাবা মীর হাসান আলী মারা যান।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি এলেন কলকাতায়। সেখানে তিনি কুস্তিতে হারিয়ে দেন আরিফ আলী ও লাল মোহাম্মদকে।

এখানে এসে তিনি ধর্ম কর্মের সাথে সাথে পীরের সন্ধান করতে থাকেন। এক সময় মক্কায় হজ্জ করতে গেলে তাঁর সাথে দেখা হয় মাওলানা মোহাম্মদ নামে এক

www.phulkuri.org.bd

ধর্মপরায়ন ব্যক্তির সাথে। তাঁর নিকট খোঁজ পেলেন আসল পীরের। আর ইনি হলেন মুজাহিদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী। অতঃপর দু'জন তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করলেন।

এবার তাঁর জীবনের বড় পরীক্ষা শুরু হলো। জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেনতিনি। চিঠি লিখেন কৃষকদেবকে। কারণ যেখানে জুলুম শোষণ সেখানেই তিতুমীর। সব জালিমের বিরুদ্ধে পর্বতের মত উঁচু শির তাঁর।

গর্জে উঠে কৃষ্ণদেব। তিতুমীরের চিঠির বাহক আমিন উল্লাহকে জর্জরিত করলো অত্যাচারে। শাহাদাত বরণ করলেন আমিন উল্লাহ। কৃষ্ণদেব জানিয়ে দেয়, তিতুমীরকে কেউ সাহায্য করলে বা জায়গা দিলে তাকে উচ্ছেদ করা হবে।

কৃষ্ণদেবের এসব অত্যাচারের কাহিনী শুনে চব্বিশ পরগনা জেলার নারিকেল বাড়িয়ার লোকেরা উত্তেজিত হলেন। তিতুমীরকে তারা নারিকেল বাড়িয়ায় আসতে আহ্বান করলেন। অবশেষে তিতু রওয়ানা হলেন নারিকেল বাড়িয়ায়।

লড়াই বাঁধলো। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গঠন করা হলো মুক্তিবাহিনী। ১৮৩১ সালের ৬ নবেম্বর কৃষ্ণদেবের দলের সাথে যুদ্ধ বাঁধলো। পরাস্ত হলো কৃষ্ণদেবের দল।

কৃষ্ণদেব উত্তেজিত করলো ইংরেজ সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্টকে। তিতুমীর প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। স্থানীয় লোকদের সহযোগতিায় কেল্লা নির্মাণ করলেন। বাঁশের কেল্লা। কেল্লায় থাকার ব্যবস্থা হলো মুক্তিবাহিনীর। কেল্লার ভেতর মসজিদ নির্মাণ শেষে জুমার দিন তিতুমীর ইমামতি করলেন। অবহিত করলেন আসন্ন বিপদের কথা জনগণকে।

১৮৩১ সালের নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ। কৃষ্ণদেবসহ কর্ণেল স্টুয়ার্ট বিশাল সুসজ্জিত বাহিনী, গোলাবারুদ, এমনকি কামান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন কেল্লায় আক্রমণ করতে। সারা রাত তারা কেল্লার চারদিক ঘিরে রাখে।

তিতুমীর রাতে সবাইকে বিপদের কথা জানিয়ে আহ্বান করলেন, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়তে।

সে রাতে নামাযে মগ্ন ছিলেন তিতুমীর। সুবহে সাদেক। আযান ভেসে আসছে দূর গাঁয়ের মসজিদের মিনার থেকে। শিশু কোলে কোন গাঁয়ের মা দাঁড়িয়ে দেখছে ভোর হল কি না। কেল্লার মধ্যে তিতুমীর সকলকে বলছেন, "ভাইসব চরম পরীক্ষার সম্মুখে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। হয়তো অনেকেই আমরা শহীদ হবো। যারা বেঁচে থাকো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম তালিম করার জন্য হাজার বিপদ মাথা পেতে নিও।

www.phulkuri.org.bd

ভোর হয়েছে। চারদিকে পাখির গুঞ্জন। পূব আকাশে ভেসে উঠেছে লাল সূর্য। মানুষ যে যার নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। গাঁয়ের কৃষকরা লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে মাঠে যাচ্ছে।

কর্ণেল স্টুয়ার্ট ও তার সৈন্যরা আস্তে আস্তে কেল্লার দিকে যাচ্ছে। কেল্লার পথে শ্বেত বসন পরিহিত মাথায় পাগড়ি বাঁধা, তসবিহ হাতে তিতুমীর দাঁড়িয়ে আছেন। কর্ণেল তখন একখণ্ড কাগজ তরবারীর আগায় বিদ্ধ করে বললেন, মহাশয় আমি লর্ড বেন্টিং-এর সেনাপতি। আমি আপনাকে গ্রেফতার করতে এসেছি। আপনি আত্মসমর্পণ করুন। দোভাষী হিসাবে রামচন্দ্রকে পাঠালেন।

তিতুমীর হেসে বললেন, আমি কোম্পানীর বিরুদ্ধে এখনো যুদ্ধ ঘোষণা করিনি। জমিদার নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি মাত্র।

রামচন্দ্র ফিরে এসে বললেন তার উল্টো। সে এসে বলে, হুজুর তিতুমীর বলেছেন সে কোম্পানীকে মানে না। এ কথা শুনে স্টুয়ার্ট উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। আদেশ দিলেন আক্রমণ করতে। তারপর শুরু হয় যুদ্ধ।

যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন শত শত বাঙ্গালী মুসলমান। শহীদ হলেন তিতুমীর। বন্দী হন মীর মাসুম ও বাকি মুক্তিবাহিনী। রক্তে লাল হয়ে গেল গোটা নারিকেলবাড়িয়ার সেই বাঁশের কেল্লা। শহীদ তিতুমীরের রক্তের বন্যায় ভেসে গেল সব। হাহাকার পড়ে গেলো সারা নারিকেলবাড়িয়ায়।

www.phulkuri.org.bd

শাহজালাল (রঃ) -এর কবুতর

হঠাৎ বাড়ীর আঙিনায় দেখা গেল একজোড়া কবুতর। ছাই রংয়ের। গলায় ঈষৎ বেগুনী ও কালো রংয়ের মিশ্রিত চকচকে উজ্জ্বল অংশ। দেখতে মালার মত। এ কবুতর সাধারণ কবুতর থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের। দেখে সবাই চিনে ফেলল। এ যে জালালী কবুতর! ভক্তিতে গদগদ সবাই। তাদের আপ্যায়নে সচেষ্ট সবাই। বলতে পারো, কেন এই কবুতরের সাথে মানুষের শ্রদ্ধার আচরণ।

কারণ, এই' জালালী কবুতর নামকরণের সাথে যে একজন মহান সাধক, বীর সেনানীর নাম লুকিয়ে আছে। এই সাধক এদেরই পুর্বপুরুষের একজোড়া কবুতর এদেশে এনেছিলেন যখন এখানে আসেন। আজ এই কবুতরের বংশবৃদ্ধি হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই মর্দে মুজাহিদের নাম 'শায়খ জালাল মুজাররাদ ইবনে মুহাম্মদ'। হযরত শাহজালাল (রঃ) এর নাম শুনেনি, এমন লোক আমাদের দেশে বিরল।

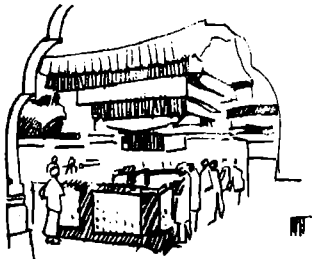

এদেশে জন্মগ্রহণ না করেও এদেশের মানুষের জন্য তিনি ইসলামের মহান বাণী নিয়ে এসে এর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে এদেশবাসীকে ধন্য করেছিলেন বলেই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সবার শ্রদ্ধার জন।

www.phulkuri.org.bd

তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট মতবিরোধ থাকলেও তাঁর শৈশব জীবন ও পরবর্তীতে এদেশে ৩৬০ জন শিস্যসহ আগমনের ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ) উৎকীর্ণ দু'খানা শিলালিপিতে "শায়খ জালাল ইবনে মুহাম্মদ" নামে তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ জানা যায়।

শৈশবে বাবা-মাকে হারিয়ে শাহজালাল (রঃ) তাঁর মামা বিখ্যাত সুফি সাইয়েদ আহম্মদ কবীর সুহরাওয়ার্দীর তত্ত্বাবধানে লালিত হন। ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি মামার সাথে ছিলেন। মামা তাঁকে উপযুক্ত ও দ্বীনি মানুষ হিসেবেই গড়ে তুলেছিলেন। শাহজালাল সারা তুর্কিস্থান, ইয়েমেন, বাগদাদ, দিল্লী হয়ে বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি যখন বাংলাদেশে আসেন তখন ছিল (১৩০১-১৩২২ খৃঃ) আমল।

সন্দেহ নেই, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের মহান উদ্দেশ্যেই তিনি এখানে ৩৬০ জন শিস্যসহ আসেন। কেননা সে সময় এ জনপদের অধিবাসীরা অধিকাংশই ছিল অমুসলিম। তাঁর সিলেট আগমন ও বিজয় সম্পর্কিত সত্য কাহিনী তোমরা অনেকেই জানো। সংক্ষেপে তা বলছি শোন- তৎকালীন রাজা গৌরগোবিন্দ ছিলেন প্রচন্ড মুসলিম-বিদ্বেষী। সিলেটের বোরহানউদ্দিন নামক একজন মুসলমান নবজাতক পুত্রের আকীকা অনুষ্ঠানে গরু কোরবানী করাতে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তার ডান হাত কেটে ফেলেন ও নবজাতককে হত্যা করেন। শাস্তিপ্রাপ্ত ও পুত্রহারা বোরহানউদ্দিন গৌড়ের সুলতান সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের দরবারে- এর প্রতিকারের প্রার্থনা করেন। গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রথমবার সুলতানের বাহিনী পরাজিত হয়। দ্বিতীয়বার সুলতান সাতগাঁও-এর গভর্ণর নাসীরুদ্দিনকে ও সেনাবাহিনী সহ পাঠালেন। ইতিমধ্যে হযরত শাহজালালের কাছেও এ সংবাদ পৌঁছে। তিনিও তখন মুসলিম বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য তাঁর শিস্যসহ ত্রিবেনী নামক স্থানে মুসলিম বাহিনীর সাথে একত্রিত হন।

এবারের যুদ্ধে গৌরগোবিন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে আসামের পার্বত্যাঞ্চলে পালিয়ে যায়। এভাবেই হযরত শাহজালালের প্রত্যক্ষ সহায়তায় তৎকালীন শ্রীহট্ট (সিলেট) শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের প্রথম বিজয় সম্পন্ন হয়। সুলতান ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ৭০৩ হিজরী সনে (১৩০৩ খৃষ্টাব্দে) সিলেট বিজিত হবার পর হযরত শাহজালাল (রঃ) সেখানেই থেকে গেলেন। তাঁর শিস্যরা বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন ইসলামের প্রচার কাজে।

মক্কার বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার নাম তোমরা নিশ্চয়ই অনেকে জানো। এই বিখ্যাত পর্যটক বাংলায় আসেন ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে হযরত শাহজালালের জীবদ্দশাতেই। ইবনে বতুতা লিখেছেন, "তাঁর কাছে তখন এদেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন"। বস্তুত সিলেট, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও আসামের পশ্চিমাঞ্চলের

www.phulkuri.org.bd

বিভিন্ন জেলার অধিকাংশ লোক যে মুসলমান হয়েছে তার সন্দেহ নেই।

এবার তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চতর শিখরে তিনি পৌঁছেছিলেন তার একটি ঘটনা আমি বলছি এবং তা ইবনে বতুতার উদ্ধৃতি দিয়েই।

শাহজালাল (রঃ) -এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য ইবনে বতুতা চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণ করে আসামের কামরূপে আসেন। দেখা হয় তাঁর সাথে। ইবনে বতুতা লিখেছেন, "তাঁর সাথে যখন আমার দেখা হয় তখন একটি সুন্দর জোব্বা শাহাজালালের পরনে ছিল। আমি জোব্বাটি পেতে মনে মনে আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু মুখে প্রকাশ করার সাহস পাইনি। এই জোব্বা সম্পর্কে শাহজালাল (রঃ) ইবনে বতুতার সাথে দেখা হওয়ার আগেই ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে, মরক্কোর অধিবাসী (ইবনে বতুতা) এ জোব্বাটি পেতে চাইবে। তারপর জনৈক কাফের বাদশাহ তাঁর নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে আমার ভাই শায়খ বোরহানুউদ্দীনকে দান করবে"।

ইবনে বতুতা বলেন, "আশ্চর্য ! বিদায়ের দিন শাহজালাল (রঃ) আমাকে জোব্বাটি দিয়ে দিলেন। আমি পুলকিত হই। সাথে সাথে তাঁর অনুচরদের মুখে জোব্বাটি হারিয়ে যাওয়ার কথা আগাম শুনে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করি, জোব্বটি গায়ে দিয়ে আমি কোন সম্মানিত ব্যক্তির সামনে যাবো না"।

এরপর কি ঘটেছে জানো ! ইবনে বতুতা চীনদেশে ভ্রমণকালে চীনের হংচৌফ শহরের বাদশাহর নজরে পড়ে জোব্বাটি। বাদশাহ জোব্বাটি নিয়ে নেন। ইবনে বতুতার তখন তা না দিয়েও উপায় ছিল না। তার মনে পড়লো শাহজালালের কথা। পরবর্তী বছরে ইবনে বতুতা চীনের রাজধানী খান বালিক শহরে (বর্তমানে বেইজিং) শায়খ বোরহনুদ্দীন সাগেরজীর খানকায় গিয়ে অতি আশ্চর্যের সাথে দেখেন যে, সেই জোব্বাটি শায়খের পরিধানে।

ইবনে বতুতা লিখেছেন, "আমি জোব্বাটি হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলাম। শায়খ আমাকে বললেনঃ তুমি কি এটা চেন? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, চিনি। খানসার (হংচৌফ) বাদশাহ এটি আমার থেকে নিয়েছিলেন। শায়খ বললেন ঃ এ জোব্বাটি শায়খ জালালুদিন (হযরত শাহজালাল) আমার জন্য তৈরী করেছিলেন এবং আমাকে পত্র মারফত জানিয়েছিলেন যে, উমুক ব্যক্তির মাধ্যমে জোব্বাটি আমার নিকট পৌঁছবে। শায়খ আমাকে পত্রটি দেখালেন। আমি পত্রটি পড়লাম এবং শায়খের নিশ্চিত সত্য ভাষণের জন্য বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। পরে আমি শায়খ বোরহানুদ্দীনের কাছে সব ঘটনা বিবৃত করলাম। সব শুনে তিনি বললেন ঃ শাহজালালের-মর্যাদা এর চাইতেও অনেক বেশী।

ইবনে বতুতা শায়খ বোরহানুদ্দীনের কাছেই হযরত শাহজালালের (রঃ) মৃত্যুসংবাদ পান। ইবনে বতুতা বাংলা ত্যাগ করার পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দেই হযরত শাহজালাল একশত পঞ্চাশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

www.phulkuri.org.bd

সিলেটের সেই নিজস্ব আস্তানাতেই তিনি সমাহিত হন। সিলেট শহরে তোমরা যদি কখনো যাও-দেখবে শহরের প্রবেশের মুখে নদীর উপর যে ব্রীজ আছে সেখানে অসংখ্যা জালালী কবুতর। এই কবুতর আরো দেখবে তাঁর মাজার প্রাঙ্গণে সিলেটের কেন্দ্রস্থলে, যেখানে তিনি শুয়ে আছেন শিষ্য-সহচরসহ। জানবে আরো কাহিনী।

পুণ্যভূমি সিলেট গর্বিত হযরত শাহজালালকে তার মাটিতে ধারণ করেই। আমরাও গর্বিত, কারণ এ জনপদের অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা ইসলামের প্রচার ও প্রসার তাঁর পবিত্র পরশেই।

www.phulkuri.org.bd

হাজী শরীয়তউল্লাহ

সে অনেক দিন আগের কথা। তখন ইংরেজ শাসন। মুসলমানদের উপর চলছে অত্যাচার। আমীর-ওমরাহ কেউ নেই। সবাই সমান। শুরু হলো কাজীদের বিচার। কোতায়াল ও ফৌজদারদের শাসন ক্ষমতা। সাধারণ মুসলমান সমাজ গড়ে উঠে চাষী, তাঁতী, শ্রমিক আর ছোট ছোট চাকুরেদের নিয়ে। এক সময় বিদেশী কাপড় এসে তাঁতও বন্ধ হয়ে গেল। এখন পথ হলো একটি, কৃষিকাজ। এবার কোম্পানীর লোকেরা তাগিদ দিতে লাগলো নীলের চাষ করতে। কিন্তু চাষীরা নীলের চাষ করতে চায় না। কিন্তু নীলের চাষ করতে বাধ্য করলো চাষীদের। চাষীরা ধানের পরিবর্তে নীলের চাষ না করলে ধরে এনে পিটানো হতো। ইংরেজদের এ অত্যাচারের সহযোগী ছিলো হিন্দু জমিদাররা। শুধু তাই নয়। খাজনার পরিমাণ বাড়ানো হলো। সন্তান জন্মালে ট্যাক্স দিতে হতো। হিন্দু জমিদারদের পূজা পার্বনের খরচ যোগাতে হতো, দাড়ি রাখলে ট্যাক্স দিতে হতো। এমনি যখন এদেশের মুসলমানদের অবস্থা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। তখন একদল ধর্মীয় সংস্কারকের জন্ম হয়। এরা ডুবন্ত মুসলমান সমাজে এনে দিয়েছিলেন বেঁচে থাকার প্রেরণা। মুমূর্ষুর কানে

www.phulkuri.org.bd

দিয়েছিলেন ইসলামের মর্মবাণী। সারা বাংলায় জেগেছিলো নতুন করে প্রাণস্পন্দন। তাঁদেরকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে একটি আন্দোলনের জন্ম নিলো। এই আন্দোলনের নাম দেয়া হলো ফরায়েজী আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে জানো? সেই মানুষ টির কথাই তোমাদেরকে বলছিলাম।

মাদারীপুর জেলার শ্যামাইল গ্রাম। এই গ্রামের একটি পরিবার। নাম তালুকদার পরিবার। আগে তাদের অনেক ভূসম্পত্তি ছিলো। পরে অবস্থা পড়ে গেছে। দিন দিন তারা গরীব হয়ে গেলেন। এই গরীব তালুকদার পরিবারের প্রধানকর্তা ছিলেন, আবদুল জলিল। সংসার চালানোর জন্যে তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হতো। তিনি যা রোজগার করতেন তা দিয়ে কোনোরকমে সংসার চলতো। ১৭৭৩ সালে তালুকদার আবদুল জলিলের ঘরে জন্ম নেয় একটি শিশু। শিশুটির জন্মের পর তালুকদার পরিবারে যেন এক আলো ঝিলিক মারে। জন্মের পর বাবা নাম রাখলেন শরীয়তউল্লাহ। এই শরীয়তউল্লাহই একদিন বাংলার নির্যাতিত মুসলমানদের পাশে দাঁড়ালেন। তিনিই তো প্রতিষ্ঠা করলেন ফরায়েজী আন্দোলন।

জন্মের পর থেকেই তাঁর দুঃখের শেষ নেই। কারণ জন্মের অল্প কিছুদিন পরই তিনি মাকে হারান। তার বয়স যখন মাত্র আট বছর তখন বাবাও পরলোকগমন করেন। একেবারে এতিম হয়ে গেলেন শরীয়তউল্লাহ। বড় ভাই বা বোন কেউ নেই যে তাঁকে লালন-পালন করবে। কিন্তু তা হলে তাঁকে কে দেখাশোনা করবে? তখন চাচা আজিমউদ্দিন এগিয়ে এলেন। তিনি শরীয়তউল্লার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করলেন। আজিমউদ্দিনের কোন ছেলে-মেয়ে ছিলো না। ফলে চাচার পরিবারে অতি আদরে মানুষ হতে লাগলেন তিনি। প্রায় সময় কিশোর শরীয়তউল্লাহ খেলাধুলা করে, ঘুরেফিরে বেড়াতেন। ইচ্ছে হলে মাঝে মাঝে কেতাবের পাতা উল্টে-পাল্টে দেখতেন।

কিন্ত এই সুখ শরীয়তউল্লার কপালে বেশি দিন সইলো না। বয়স মাত্র বার বছর। এ সময় চাচা একদিন বকুনি দিলেন। পিতা-মাতা হারা শরীয়তউল্লাহ চাচার বকুনি সহ্য করতে পারলেন না। তাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেলেন কলকাতায়। সময়টা ১৭৯৩ সাল।

কলকাতায় তো আর আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। তা হলে তাঁকে আশ্রয় দেবেন কে? তা ছাড়া কিছু একটা তো করতে হবে। তাই আশ্রয়ের খোঁজে এদিক-সেদিক ঘুরছেন। একদিন এক বিখ্যাত মৌলানা সাহেবের দয়া হলো। এই বিখ্যাত মৌলানা পণ্ডিতের নাম মৌলানা বাশারত আলী। তিনি শরীয়তউল্লাকে আশ্রয় দিলেন। ভর্তি করে দিলেন নিজের মাদ্রাসায় কুরআন শিক্ষার ক্লাসে।

www.phulkuri.org.bd

কুরআন শিক্ষার পর ওস্তাদের অনুমতি নিয়ে তিনি চলে গেলেন হুগলিতে। এখানে এসে তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষা আয়ত্ত্ব করলেন। তখন মুর্শিদাবাদের নওয়াবের দরবারে কাজ করতেন তাঁর আরেক চাচা আশিক মিয়া। তিনিও ছিলেন সুপণ্ডিত। একদিন শরীয়তউল্লাহ চলে গেলেন মুর্শিদাবাদে চাচার কাছে। এখানে চাচার কাছে থেকে এক বছর আরো জ্ঞান অর্জন করলেন।

তারপর কি হলো জানো? চাচা-চাচীর সঙ্গে রওয়ানা করলেন নিজ বাড়িতে। নৌকায় করে রওয়ানা করেছেন তারা। মাঝপথে এসে এক দুর্ঘটনায় নৌকা ডুবে গেলো শরীয়তউল্লাহ কোন রকমে বেঁচে গেলেন কিন্তু চাচা-চাচীর খোঁজ পেলেন না। এ ঘটনা খুব নাড়া দিয়েছিলো শরীয়তউল্লাহকে। তিনি আর বাড়ি গেলেন না। ফিরে এলেন কলকাতায়। দেখা করলেন তাঁর পুরানো শিক্ষক বাশারত আলীর সঙ্গে। কিন্তু ইংরেজদের উপর মৌলানা বাশারত আলী খুবই বিরক্ত। তিনি আর এদেশে থাকতে চাইলেন না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এদেশ ছেড়ে চলে যাবেন। শরীয়তউল্লাহও ওস্তাদের সাথে যেতে চাইলেন। তাই তিনি সঙ্গে নিতে রাজি হলেন।

১৭৯৯ সাল। শরীয়তউল্লার বয়স মাত্র তখন ১৮ বছর। গুরু-শিষ্য মিলে রওয়ানা করলেন মক্কায়। মক্কায় এসে প্রায় উনিশ বছর কাটিয়ে দিলেন। তিনি কি করলেন এই উনিশ বছর? এখানে এসে তিনি আশ্রয় নিলেন মৌলানা মুরাদ নামে এক ভদ্রলোকের কাছে। মুরাদ সাহেব ছিলেন একজন বাঙ্গালী। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। শরীয়তউল্লাহ তাঁর কাছে আরবী সাহিত্য ও ইসলামী আইন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। এভাবে তিনি শুধু জ্ঞান আহরণে ব্যস্ত।

তোমরা কি বড় পরী আবদুল কাদের জিলানীর নাম শুনেছ? হ্যাঁ, আবদুল কাদের জিলানীর এক অনুসারী ছিলেন তাহির মসবল নামে। তিনি ছিলেন একজন সুফী-সাধক। শরীয়তউল্লাহ এবার তাহির মসবলকে ওস্তাদ হিসেবে মেনে নিলেন। জানা যায়, তাহির মসবলের আদি বাস ছিলো রোহিলা খণ্ডের মুরাদাবাদ জেলার সমবল শহরে। চৌদ্দ বছর পড়াশোনার পর শরীয়তউল্লাহ আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন। এখানে তিনি হিকমত নিয়ে পড়াশোনা করেন। ১৮১৮ সালে দীর্ঘ কুড়ি বছর পর মক্কা থেকে তিনি নিজের জন্মস্থানের দিকে রওয়ানা করলেন।

বাড়ি ফেরার পথে ডাকাতের হাতে পড়েন তিনি। ডাকাতরা তাঁর সবকিছু লুট করে নিয়ে গেলো। এরপর তিনি মুঙ্গের জেলা অতিক্রম করে এলেন ফরিদপুরে। তখন তাঁর মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় ইয়া বড় পাগড়ি। পরনে আলখেল্লা। গ্রামের লোকজনতো কেউ তাঁকে চিনতে পারে না। শরীয়ত উল্লাহ দেখা করলেন চাচা আজিমুদ্দিনের সঙ্গে। এর মধ্যে মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে গেছে। সারা গ্রাম

www.phulkuri.org.bd

রটে গেছে মক্কা থেকে এক হাজী সাহেব এসেছেন শ্যামাইল গ্রামে। তিনি দেখলেন নামায পড়তে কেউ এলেন না। কারণ হিন্দুদের সাথে থাকতে থাকতে এবং তাদের অত্যাচারে আর নির্যাতনে সকল মুসলমান তার ধর্মীয় অস্তিত্ব সব ভুলে গেছে। শুধু নামে মাত্র মুসলমান রইলো। কিন্তু নামায-রোযার বালাই নেই। এটা করলে তো হিন্দু জমিদার আর ইংরেজদের অত্যাচার ভোগ করতে হতো। তিনি একাই নামায পড়লেন।

নামায পড়ে গেলেন চাচার সাথে দেখা করতে। চাচা খুবই অসুস্থ। সেদিন রাতেই চাচা আজিমুদ্দিন মারা গেলেন।

আচ্ছা তোমরা কি বলতে পারো, কি করতে চেয়েছিলেন হাজী শরীয়তউল্লাহ? তিনি চেয়েছিলেন, ইসলাম ধর্মকে শুদ্ধ করে তুলতে। ইংরেজদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদের বাঁচাতে। তোমরা হয়তো বলবে এটা আবার কি জিনিস। হ্যাঁ, তা হলে বলছি শোন। এদেশে তখন ইসলাম ধর্মের ভেতর লৌকিক এবং হিন্দু ধর্মের অনেক রীতিনীতি চালু ছিলো। তখন অধিকাংশ লোকই ছিলো নিরক্ষর। হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারে নিজের ধর্মকর্ম সবই তারা ভুলে গেলো। তিনি ইসলাম ধর্মের প্রচারে নেমে পড়লেন। দলে দলে মুসলমানরা তার অনুসারী হতে শুরু করলেন। আর তখনই তিনি যে মতবাদ প্রচার করেন সেই মতবাদকে দেওয়া হয় ফরায়েজী মতবাদ। আমরা যাকে ফরায়েজী আন্দোলন নামে জানি। এই ফরায়েজী আন্দোলন পরে ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে থাকেনি তা জমিদার ও কৃষক প্রজার মধ্যে সংঘর্ষে রূপ নেয়। এভাবে কৃষকদের তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ করেছিলেন। এই ফরায়েজী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। শরীয়তউল্লাহ এক সময় মক্কা চলে গেলে দেখা দেয় নেতৃত্বের অভাব। সে কারণে ফরায়েজী আন্দোলন আস্তে আস্তে মরে গেল। তখন তাঁর ছেলে দুদু মিয়া এই আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। মুসলমানদের মধ্যে লাঠিয়াল তৈরী করা হলো। ইংরেজদের নানা অন্যায়ের প্রতিবাদ করা শুরু হলো। মুসলমানরা মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো। এসব কিছুই হাজী শরীয়তউল্লাহ-এর বদৌলতে হয়েছে। মুসলিম রেনেসাঁর এই অগ্রপথিক হাজী শরীয়তউল্লাহ ১৮৩৯ সালের ২২ জানুয়ারি এই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে চলে যান পরজগতে। দিশেহারা মুসলমান জনসাধারণ হারিয়ে ফেলেন তাদের পুনর্জাগরেণের এক যোগ্য অভিভাবককে।

www.phulkuri.org.bd

কর্মবীর মুন্সী মেহেরউল্লাহ

যশোর জেলার কালিগঞ্জ থানা। এই থানার বারো বাজারের নিকটবর্তী একটি গ্রাম। নাম তার ঘোপ। ঘোপ গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম হয় এক মহামনীষীর। দিনটি ছিল ১৮৬১ সালের ২৬ ডিসেম্বর। যিনি পরবর্তীতে ইতিহাসের পাতায় বাংলার মুসলমানদের কাছে একজন কর্মবীর হিসেবে অমর হয়ে আছেন। তাঁর জন্মের পর বাড়িতে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। সবার মুখে হাসি। একই কথা নতুন মেহমান এসেছে। আনন্দ আর ধরে না যেন। আলোকিত হয়ে গেল ঘোপ গ্রাম। সবার কোলে কোলে সে। খুশিতে ভরে গেল মায়ের বুক। এভাবে একদিন দু'দিন করে ছয়মাস কেটে গেল। শিশু এখন একটু বড় হয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে সামনে পেছনে যেতে পারে। হাত-পা নেড়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে খিল-খিলিয়ে হাসতে পারে। এমন সুন্দর শিশুকে আদর করতে কার না মন চায়। এভাবে আর কতদিন কাটাবেন নানাবাড়ি। এবার নিজের বাড়ি যেতে হবে। ছাতিয়ান তলায় তার পৈত্রিক বাড়ি। মা তাঁকে নিয়ে একদিন ছাতিয়ান তলায় চলে এলেন।

ছাতিয়ান তলা গ্রামকে নিয়ে আজ যেমন অনেক ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে।

www.phulkuri.org.bd

আগেও এই গ্রামকে নিয়ে ছিল অনেক কল্প কাহিনী। এক সময় নাকি ছাতিয়ান তলা ছিল বিরাট জঙ্গলে ভরা একটি নির্জন স্থান। সে সময় এই স্থানে একটি বিরাট ছাতিয়ান গাছ ছিল। এই ছাতিয়ান গাছ ছায়া দিয়ে ঘিরে রাখতো এই স্থানটিকে। দূর থেকে ছাতিয়ান গাছটি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। দূর দূরান্তের পথিকেরা এই গাছের নীচে বসে বিশ্রাম নিতো। কত গল্প গুজবের আসর বসতো এই ছাতিয়ান তলায়। কালে এই স্থানে লোকবসতি শুরু হলো। আস্তে আস্তে এক বাড়ি, দুই বাড়ি করে একটি গ্রামের সমান হয়ে গেল। আর গ্রামটির নামকরণও করা হলো "ছাতিয়ান তলা"। এতক্ষণ যাকে উপলক্ষ করে তোমাদের এত গল্প বল্লাম, তাঁর মৃত্যুর পর এই ছাতিয়ান তলায়ই তাঁকে দাফন করা হয়।

ছাতিয়ানতলার ছায়া সুনিবিড় জমিনের নীচে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন তিনি।

তোমাদের হয়তো এক্ষুনি তার নাম জানতে ইচ্ছে করছে তাই না? হ্যাঁ তাঁর কথা কে না শুনতে চায় বল? তাঁর কথা জানতে হবে তোমাদের। তবেই না তোমরা বুঝতে পারবে বাংলার মুসলমানদের জন্য তাঁর দান কত। কেন তিনি আমাদের স্মরণীয়। তাহলে বলছি শোন-

তিনি হলেন মুন্সী মুহাম্মদ মেহেরউল্লাহ। পিতার নাম মুন্সী মুহাম্মদ ওয়ারেছউদ্দীন।

মুন্সী মেহেরউল্লাহর জন্ম হয় রামমোহনের মৃত্যুর পর। এর আগেই তিতুমীরের সংগ্রামের ব্যর্থ হয়। ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ, দুদুমিয়া -এর পূর্বেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তখন মুসলমানদের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। যার ফলে ইচ্ছে থাকলেও মুসলমান ছেলেরা লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হতো। একই অবস্থা ঘটেছে মুন্সী মেহেরুল্লার ক্ষেত্রেও। তবুও তিনি মূর্খতার আশ্রয় না নিয়ে হিন্দু পাঠশালায় গিয়ে ভর্তি হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "বর্ণ পরিচয়" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং "বোধদয়" শেষ করার পর তাঁর পিতা ওয়ারেছউদ্দীন ইন্তেকাল করেন। পরে তিনি বাল্যশিক্ষাও শেষ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর মেহের ভাবছে কি করবে। তাঁকে যে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। অনেক জ্ঞান শিখতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এই লড়াইয়ে জিততে হবে তাকে। মা বলেছেন, "উপায় একটা খুঁজে বের করতেই হবে বাবা। লেখাপড়া না করলে মানুষ হবে কি করে। তোকে যে বড় হতে হবে, জানতে হবে অনেক কিছু। প্রয়োজনে আমার হাতের বাজু দু'টি বিক্রি করে দাও। তবুও চেষ্টা কর মানুষ হওয়ার।" মা ঠিক করলেন কয়ালখালির মৌলভী মেসবাহউদ্দীনের কাছে পাঠিয়ে দেবেন মেহেরকে। অবশেষে মা ও মামাদের উৎসাহে মেহের আরবী, ফরাসী ভাষা ও কোরআন শরীফ শিক্ষা লাভ করেন। অতি সংক্ষিপ্ত ছাত্র জীবন তাঁর।

www.phulkuri.org.bd

দারিদ্রের চাপে লেখাপড়া আর শিখা হলো না। বের হলেন চাকরির খোঁজে। মিলেও গেল একটি চাকরি। কিন্তু বেশিদিন ভাল লাগেনি তার। তাই বাদ দিলেন চাকরি। পরে খোঁজার হাটে এক দর্জির দোকানে দর্জির কাজ শিখেন। অবশেষে যশোরের দড়াটানায় দর্জির দোকান দিলেন তিনি। এবার তিনি দর্জির দোকানের একজন পাকা খলিফা। দর্জির কাজ করে যা আয় হয় তা দিয়ে সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন।

মেহের এক নাগাড়ে ঘুরিয়ে যাচেছন সেলাই মেশিনের চাকা। মনে মনে ভাবছেন কত কিছু। মেশিনের খটা খট শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ কানে এলো মানুষের কান্নার শব্দ। কে কাঁদে? মেশিন চালানো বন্ধ করলেন। কান পেতে শুনলেন কান্নার শব্দ কোন দিক থেকে আসছে। আস্তে আস্তে তাঁর ঘরের কাছে চলে এলো এই কান্না। অনেক লোক। ঘরের ভেতর ঢুকেই কয়েকজন হুমড়ি খেয়ে পা জড়িয়ে ধরলো মেহেরউল্লাহর। তিনি পা ছাড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এমন করছো কেন? কেউ বললো, মুন্সী সাহেব ওরা দাঁড়ির খাজনা না দিলে আমার দাঁড়ি কেটে ফেলতে বলেছে। কেউ বললো, হুজুর আমাকে বাঁচান, খাজনার দায়ে আমার ছেলে দু'টোকে ধরে নিয়ে গেছে। কেউ বললো, হুজুর খ্রিষ্টান পাদ্রীরা আমার ছেলেটাকে জোর করে খ্রিষ্টান বানিয়ে ফেলেছে। আমাদের বাঁচান হুজুর, আমাদের বাঁচান।

ওদের আর্তনাদে থেমে গেলো সেলাই মেশিনের চাকা। নিস্তব্ধ দোকান। খটখট শব্দ নেই। সারা ঘরময় গোঙ্গানো কান্নার শব্দ। ভারি হয়ে গেল ঘরের বাতাস। ভাবনায় পড়ে গেলেন মেহের। কি করবেন এখন তিনি? তাঁকে তো বসে থাকলে চলবে না। কিছু একটা করতেই হবে তাঁকে। মাথা তুলে দাঁড়ালেন তিনি। তাদের অপ-তৎপরতা ধুলামলিন করে দেবার জন্যে গর্জে ওঠেন মেহের। মেশিনের প্যাডেল থেকে পা নামিয়ে বের হলেন ঘর থেকে। ঐক্যবদ্ধ করতে লাগলেন দেশের সকল মুসলমানকে। তখনকার দিনে যুক্তিতর্ক দিয়ে বক্তৃতা করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হতো। মুন্সী সাহেব নেমে পড়লেন বক্তৃতার ডালি নিয়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ত্রিপুরার মাঠে-ময়দানে। তাঁর জ্বালাময়ী তীক্ষ্ণ বক্তৃতায় ক্ষতবিক্ষত হলেন খ্রিষ্টানরা। বক্তৃতার মঞ্চে এসে মেহেরউল্লার সাথে যুক্তিতর্ক দেখাতে না পেরে ভয়ে পালিয়ে যায় কত পাদ্রী। আবার অনেকে তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হতে লাগলো। তাঁর ডাকে "নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার" শ্লোগানে মুখরিত হয়ে গেল গোটা দেশ। সবার সাথে দুঃখের অংশীদার হলেন তিনি। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই তাঁর। বিজয় আনতে হবে। বাঁচাতে হবে দেশের গরীব মুসলমানদেরকে।

তখনকার দিনে হিন্দুরা ইংরেজদের সাথে এক হয়ে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করতো। খ্রিষ্টানদের কাজে তারা সহযোগিতা দিত। তাদের যৌথ অত্যাচারে

www.phulkuri.org.bd

মুসলমানরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। অথচ শত শত বছর ধরে মুসলমান শাসকদের আমলে হিন্দুরা তাদের ধর্ম-সংস্কৃতি নিয়ে ছিল স্বাধীন। ইংরেজরা হস্তক্ষেপ করার পর হিন্দুরা তাদের সাথে মিশে মুসলমানদের উপর শুরু করলো অত্যাচার। এমনকি হিন্দু শিক্ষিত লোক যাদেরকে বুদ্ধিজীবী বলা হয় তারাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কলম ধরলো। এই শত্রুদের ভয় না করে সামান্য শিক্ষা নিয়ে মুন্সী মেহেরউল্লাহ একাই মুসলমানদের পক্ষ হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। মঞ্চে, ময়দানে বক্তৃতার সাথে সাথে কলমও ধরলেন তিনি। তাঁর লেখা খ্রিষ্টান পাদ্রী ও হিন্দুদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল। হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষার জন্য তাঁর ধর্মীয় প্রচারণা ব্যাপকভাবে শুরু হলো। তাঁর ডাকে গ্রামের মানুষ পঙ্গপালের মত ছুটে আসতে লাগলো। তাঁর লেখনী ও বক্তৃতা এত সুন্দর যুক্তিপূর্ণ ছিল যে, অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণ ও খ্রিষ্টান পাদ্রী পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হতে লাগলো। এভাবে অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলে একজন দর্জি মুন্সী মেহেরউল্লাহ উনবিংশ শতাব্দীর একজন মহাপুরুষ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। যার জীবনাদর্শ আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

অতিশয় সংবেদনশীল মুন্সী মেহেরউল্লাহ জন্মগতভাবেই ছিলেন বিপুল মেধা সম্পন্ন। তাঁর শানিত বুদ্ধি অকাট্য যুক্তিতে সেদিন এদেশে খ্রিষ্টান শক্তি কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তিনি এককভাবে বিজয় ছিনিয়ে আনেন এই সংগ্রামে। তিনি মাঠে ময়দানে মুখোমুখি লড়াইয়ে অংশ নিয়ে গোটা মুসলিম জাতিকে বিজয়ী করেন।

১৮৭০ সাল। ২৪ জৈষ্ঠ্য শুক্রবার দুপুর একটার সময় এই মহামনীষী ইন্তেকাল করেন।

মুন্সী মুহাম্মদ মেহেরউল্লাহ একটি নাম, একটি ইতিহাস। তিনি আমাদের জন্য তাঁর কর্মময় জীবনে যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হাজার হাজার বছরের লালিত ফসল বুকে নিয়ে যে বাঙালী মুসলমানরা গর্বিত, তাদের এই অহংকারকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে ইংরেজরা সর্বগ্রাসী থাবা মেরেছিল। তাদের এই থাবার হাত থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতেই যেন মুন্সী মুহাম্মদ মেহেরউল্লাহ জন্মে ছিলেন।

আজকে আমাদের জীবনে প্রয়োজন একজন মুন্সী মেহেরউল্লার, যিনি শত বছর পূর্বের ন্যায় অন্যায় জুলুম আর মিথ্যাচার থেকে রক্ষা করতে পারে এ জাতীকে। অসহায় মানুষ যাতে জুলুমের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। এমন সাহস দিতে পারে।

www.phulkuri.org.bd

দ্বিতীয় খন্ড

www.phulkuri.org.bd

সূচীপত্র

সবার প্রিয় কবি ইকবাল/৪৩
মহা কবি কায়কোবাদ/৪৭
বিদ্রোহী কবি নজরুল/৫১
পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীন/৫৪
কবি ফররুখ/৫৮
প্রিয় মানুষ প্রিয় কবি/৬৪
শিশুসাহিত্যিক নাসির আলী/৬৭
কবি আব্দুস সাত্তার/৭১
আবুল খায়ের মুসলহে উদ্দিন/৭৪
আতোয়ার রহমান/৭৭
সবার বন্ধু নূরী ভাই/৭৯
কবি গোলাম মোহাম্মদ/৮৩

www.phulkuri.org.bd

সবার প্রিয় কবি ইকবাল

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট নগরী। এই নগরীর একটি মুসলিম পরিবারের প্রধান শেখ নূরমুহাম্মদ। তিনি ছিলেন সুফী মনোভাবাপন্ন একজন খাঁটি মুমিন। বয়স মাত্র চল্লিশ বছর।

একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন, একটি প্রশস্ত মাঠে বহুলোক। তারা সবাই হাত বাড়িয়ে আকাশে উড্ডয়নরত একটি মনোরম পাখিকে নিজেদের আয়ত্তে আনার জন্য চেষ্টা করছেন। পাখিটি কখনো নীচে নেমে আসছে, আবার কখনো উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। পরে হঠাৎ করে নীচের দিকে ধাবিত হয় এবং তাঁর কোলে এসে স্থান নেয়।

শেখ নূরমুহাম্মদ স্বপ্নে আরো দেখেন তাঁর ঘরে এমন একটি পুত্র জন্ম নেবে, যে বড় হয়ে ইসলামের সেবায় আত্মোৎসর্গ করে অস্বাভাবিক খ্যাতি ও কৃতিত্ব লাভ করবে।

বাস্তবে তাই ঘটলো। ১৮৭৭ সাল। ৯ নভেম্বর। সেদিন ছিল শুক্রবার। রাত শেষের দিকে। চারদিক থেকে ভেসে আসছে ফজরের আজান। আসসালাতু খাইরুম মিনাননাউম। ঠিক এই সময় ঘর আলোকিত করে শেখ নূরমুহাম্মদের ঘরে

www.phulkuri.org.bd

জন্ম নিলেন ফুটফুটে চাঁদের মতো একটি শিশু। এই শিশুকে পেয়ে যেন মায়ের আনন্দ আর ধরে না। বাবা আদর করে নাম রাখলেন ইকবাল।

ইকবালের মাতার নাম ইমাম বি। তিনি প্রচলিত অর্থে লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন। ধর্মীয় কার্যাদি পালনে সচেষ্ট থাকতেন। সন্তান লালন-পালনে এবং সত্যিকার আদর্শে আদর্শবান করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি যত্মবান ছিলেন। ফলে ইকবালের মতো এক বিরাট ব্যক্তিত্বের জননী হবার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছিলেন। গৃহস্থালির কাজে ছিলেন তিনি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। ইকবালের পিতা শেখ নূরমুহাম্মদ ছিলেন ডেপুটিওযীর আলীর কাপড় সেলাইয়ের কাজে নিয়োজিত। মাতা ইমাম বি'র বিবেচনায় ডেপুটিওযীর আলী থেকে প্রাপ্ত টাকা সন্দেহজনক ছিল। তাই তিনি বকরী পুষতেন। শিশু ইকবালকে বকরীর দুধ পান করাতেন। যেন শিশু ইকবালের মধ্যে হারাম রিযিকের কোনো প্রতিক্রিয়া না থাকে।

দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশু ইকবাল মাতা ইমাম বি'র আদর-যত্নে লালিত পালিত হতে থাকেন। বিদ্যুতের আলো থেকে বঞ্চিত ঘরের স্বল্প পরিসরে তিনি হাঁটতে শিখেন। শিক্ষা আরম্ভ হবার পর ঐ বাড়িরই এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে প্রাথমিক পাঠ অনুশীলন করেন। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ইকবাল বড় হতে লাগলেন।

বাবা ইসলামের ব্যাখ্যা শোনার জন্য ইকবালকে মসজিদের ইমাম মাওলানা আবু আবদুল্লাহ গুলাম হাসানের কাছে দিয়ে যেতেন। এই মাওলানার কাছেই ইকবাল কুরআন মজীদ খতম করেন।

উপস্থিত বুদ্ধি তাঁর খুব বেশী ছিল। কবুতর পোষা, ঘুড়ি উড়ানো এবং আখড়ায় গিয়ে মল্লযুদ্ধ করতেন। বাড়ির ছাদের উপর ঘন্টার পর ঘন্টা কবুতর উড়াবার আনন্দ উপভোগ করতেন। কবুতরের উড্ডয়ন থেকে তাদের জাত ও বংশের পরিচয় জানার চেষ্টা করতেন।

ইকবাল স্কচ মিশন স্কুল থেকে ১৮৯৩ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করে মেডেল ও পদক লাভ করেন। ১৮৯৫ সালে এফ এ পাস করার পর লাহোর সরকারী কলেজে বি এ ক্লাসে ভর্তি হন। কুয়ালড্রিঙ্গল হোস্টেলের এক নম্বর কামরায় সীট পান। শিক্ষা সমাপন পর্যন্ত এখানেই বারো বছর কাটান। ১৮৯৭ সালে আরবী ও ইংরেজীতে বিশেষ কৃতিত্ব সহকারে গোল্ড মেডেল নিয়ে বি এ পাশ করেন। ১৮৯৯ সালে দর্শনে এম এ পাস করেন।

তারপর তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন কলেজে আরবী, ইংরেজী, দর্শন, ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তবে বেশী দিন তিনি এই

www.phulkuri.org.bd

পেশায় ছিলেন না। ১৯০৫ সালে অর্থাৎ সাড়ে ছয় বছরকাল অধ্যাপনা করার পর তিনি ইংল্যাণ্ডে চলে যান। সেখান থেকে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে ১৯০৮ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে শিয়ালকোটে অবস্থান করেন এবং এখানে তিনি ওকালতি পেশা শুরু করেন। এর পাশাপাশি অধ্যাপনাও করতেন।

বাল্যকাল থেকেই কবিতার প্রতি ইকবালের অনুরাগ ছিল। তাঁর ছন্দপ্রবণ মন ছিল। তিনি বাজার থেকে ছোট বড় কবিতার বই কিনে আনতেন। রাতে ঘরের সবাইকে আবৃত্তি করে শোনাতেন। মাঝে মাঝে নিজের পক্ষ থেকেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনুষঙ্গিক বাক্য অথবা পুরো একটি পঙক্তি যথাস্থানে সংযোজন করে দিতেন।

ইকবাল কবে থেকে কবিতা রচনা শুরু করেন তার সঠিক সন-তারিখ নির্ণয় করা কঠিন। কারণ তা কখনো হঠাৎ করে হয়নি। যেমন একটি শিশু হঠাৎ কথা বলতে পারে না। তবে অল্পকালের মধ্যেই তিনি একজন বড় কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

জীবন ও জগৎ নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে প্রকৃতির রহস্যাবলী সম্পর্কে ইকবালের সম্যক জ্ঞান লাভ হতে থাকে। ফলে তার মানসপটে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তিনি পিতার কাছে বিষয়টি খুলে বলেন এবং উপদেশ কামনা করেন। এটাই ছিল আসলে ইকবালের কাব্যপ্রতিভার তীব্র অনুভূতি বা এক অব্যক্ত চাপ, যা অতি প্রবল বেগে তাঁর স্বত্তার মাঝে সাড়া জাগিয়েছিল। মাথায় কবিতা রচনার ঝোঁক এলে তিনি হুক্কা টানতেন এবং ঐশী প্রভাব ও প্রেরণায় ক্রমাগতভাবে একের পর এক চরণ রচনা ও আবৃত্তি করে যেতেন। কাছে যারা থাকতো তারা তা লিপিবদ্ধ করে যেতো। আধ্যাত্মিক পীর ও মুরশিদ মাওলানা জালালউদ্দিন রুমীর সাথে তাঁর আশ্চর্য রকমের মিল ছিল। মাওলানা রুমীর মাঝে যখন কবিতার ঢল নামতো, তখন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে একাধারে তা লিপিবদ্ধ করে নিতেন।

ইকবালের প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ ও বাহন ছিল তাঁর উর্দু কবিতা। তবে তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটেছে উর্দুর তুলনায় ফার্সীতে অনেক বেশী। ইকবাল ছিলেন বিশ্ব মানবতায় বিশ্বাসী। ফলে তাঁর কবিতায় ও লেখায় বিশ্ব মানবতার ধ্যান-ধারণা অত্যন্ত সফলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

মনে কবিতার ভাব উদয় হলে ইকবাল অত্যন্ত অস্থিরতা বোধ করতেন। চেহারার রং পাল্টে যেতো। তিনি বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে থাকতেন। কখনো উঠে বসে দুই হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে দিতেন। কোনো কোনো দিন রাত দু'তিনটার সময় হাতে তালি বাজিয়ে আলী বখসকে ডাকতেন এবং খাতা, কলম, কালি ইত্যাদি আনতে বলতেন। সব সরঞ্জাম নিয়ে খাতায় কবিতা লিপিবদ্ধ করতেন।

www.phulkuri.org.bd

যেন এক অব্যক্ত বেদনার উপসম হতো। তখন তিনি শুয়ে আরামের সাথে ঘুমিয়ে পড়তেন। এক সময় বিশ্ব বরেণ্য কবি হিসাবে তাঁর নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো।

ইকবাল আম খুবই পছন্দ করতেন। গ্রীষ্মকালে তাঁর জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমের ঝুড়ি আসতো। অন্যান্য ফলও তিনি খেতে পছন্দ করতেন। শীতের মওসুমে আফগানিস্তানের বাদশা তাঁর জন্য নিয়মিত সবদা, আঙ্গুর ও শুকনো ফলফলাদি পাঠাতেন। তিনি রাতে খেতেন না। শুধু এক পেয়ালা কাশ্মিরী চা পান করতেন। তাঁর খাদ্যাভ্যাসও ছিল সীমিত। দিনে মাত্র একবার অর্থাৎ দুপুর বেলায় খেতেন।

ইকবাল সাধারণত জাতীয় পোশাকই পরিধান করতেন। বাসায় তিনি সব সময় সেলাই বিহীন লুঙ্গী ও গেঞ্জী পরতেন। শীতকালে অবশ্য শার্ট পরে উপরে চাদর পরতেন। বাইরে গেলে সাধারণত শেলওয়ার কামিজ ও আচকান অথবা কোট পরতেন। পায়ে পাম্প সু অথবা দেশী জুতা পরতেন। মাথায় রুমী টুপি অথবা কালো রঙের কালাকুলীর উঁচু টুপি পরতেন।

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি এই মানুষটি অসুস্থ হয়ে পড়েন। শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলো। তারপর এপ্রিল মাসের দিকে কফের সাথে রক্ত যাওয়া শুরু হয়। অনেক সময় কাঁপতে কাঁপতে অচেতন হয়ে পড়তেন। একবার অজ্ঞান হয়ে খাটিয়া থেকে নীচেই পড়ে যান।

১১ এপ্রিল। গভীর রাত। ইকবাল এক গ্লাস শরবত পান করলেন। সকাল পাঁচটায় একবার ইকবাল তাঁর উভয় হাত বুকের উপর রাখেন। মুখ দিয়ে হায় শব্দ বের হয়। তিনি বলেন, বুকে দারুণ ব্যথা। এমন সময় "আল্লাহ" শব্দটি উচ্চারণ করেন। আর তখনি তাঁর মাথা একদিকে ঢলে পড়ে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ষাট বছরের কিছু বেশী।

বন্ধুরা তা হলে বুঝতেই পারছ কেমন মানুষ ছিলেন কবি ইকবাল।

www.phulkuri.org.bd

মহাকবি কায়কোবাদ

মহাকবি কায়কোবাদের জন্মসন নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এতে কেউ বলেছেন ১৮৫৩, কেউ বলেছেন ১৮৫৪, আবার কেউ বলেছেন ১৮৫৭ সালে কায়কোবাদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কায়কোবাদ তাঁর জন্মমাস এবং বারের উল্লেখ করলেও জন্মতারিখ সম্পর্কে কিছু বলেননি। এ সম্পর্কে কোথাও কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অতএব প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, কায়কোবাদের জন্ম ১২৬৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের জুন মাসে। সে হিসাবে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

ঢাকা জেলার আগালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কবি। তাঁর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী। পিতার নাম শাহমত উল্লাহ আল কোরেশী ওরফে এমদাদ আলী। মাতার নাম জোমরতউন্নেসা ওরফে জরিফউন্নেসা খাতুন। জানা যায়, কায়কোবাদের পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন আরবের বিখ্যাত কোরেশ বংশীয়। বাগদাদ বা তাঁর নিকটবর্তী অঞ্চলে ছিলো তাঁদের বাসস্থান। সেখান থেকে বাদশাহ্ শাহজাহানের রাজত্বকালে

www.phulkuri.org.bd

তাঁরা ভারতে আগমন করেন। তাঁর পূব পুরুষদের ছিল আরবী ও ফারসীতে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞানের সাধনা ও স্পৃহা। কাজেই তৎকালীন ভারতে মোগল রাজত্বের আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মচর্চার উপযুক্ত স্থান দিল্লীতে এসে হাজির হন পরবর্তীতে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোড়াইল নামক স্থানে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন আইন ব্যবসায়ী। ফরিদপুরের ভাঙ্গা কোর্টে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এক সময় তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং এখানেই ওকালতি শুরু করেন। এর আগে তাঁর নিঃসন্তান অবস্থায় দুই স্ত্রী মারা যান। ফলে তিনি ঢাকায় এসে নবাবগঞ্জ থানার আগালা পূর্বপাড়া গ্রামে বিয়ে করেন। এখানেই জন্মগ্রহণ করেন মহাকবি কায়কোবাদ।

অল্প বয়সে বাড়িতে বসে আরবী পড়ার মাধ্যমে কবি কায়কোবাদের লেখাপড়া শুরু হয়। তারপর তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তখন ঢাকায় পগোজ স্কুল, সেন্ট গ্রেগরী স্কুল ও জগন্নাথ স্কুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলো। কায়কোবাদ এই তিনটি স্কুলেই পড়াশুনা করেন। কিন্তু তাঁর পিতার অকাল মৃত্যুতে শিক্ষাজীবন বড় অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। ফলে তিনি ঢাকা ছেড়ে আগলায় চলে যান। এক সময় আজিমজান নামে তাঁর পিতার এক বন্ধুর আর্থিক সহযোগিতায় তিনি ঢাকা মাদ্রাসায় ভর্তি হন।

কিন্তু স্কুল মাদ্রাসার নিয়ম মাফিক পড়াশুনা কবির ভালো লাগতো না। বরং বাইরের সবুজ প্রকৃতি ও উদার মুক্ত পরিবেশ কবির মনকে পাগল করে তুলতো। আগলার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ইছামতী নদীর আকর্ষণ সেই শৈশবেই কবিকে অভিভূত করেছিল। তারপর ঢাকার অরণ্যময় রমনা অঞ্চলের স্নিগ্ধ মনোরম শোভা কিশোর কায়কোবাদের কবিসত্তাকে আলোড়িত করে তীব্রভাবে। স্কুল থেকে পালিয়ে এসে প্রায়ই তিনি রমনার সবুজ স্নিগ্ধ নির্জন রূপ ও সৌন্দর্যকে উপভোগ করতেন। ফলে ঢাকা মাদ্রাসায়ই তার শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে। কবি তাঁর কুসুম কানন কাব্যের একটি কবিতায় লিখেছেন-

প্রাণাধিক পিতা মোরে বাঁধিয়া ছাদিয়া জোরে
বড় এক পাঠশালে, দিয়াছিল পড়িতে।
গুরুমশায় কত রোষ ভরে অবিরত,
পিঠ ফাটাইয়া দিত কষাকষা বারিতে।
আমিও সময় পেলে পুস্তক সেলেট ফেলে
পালাতেম চুপে চুপে গোল্লাছুট খেলিতে।
আবার বৃষ্টির পরে ভিজায়ে বসন চয়ে
শিক্ষককে ফাঁকি দিয়া আসিতাম বাড়িতে।

www.phulkuri.org.bd

তাঁর ছাত্র জীবনেই প্রকাশিত হয় প্রথম দু'টি কাব্যগ্রন্থ। ১৮৭৯ সালে 'বিরহ-বিলাপ', ১৮৭৩ সালে 'কুসুম কানন'।

কর্মজীবনে কবি ডাকবিভাগে একটি ছোট্ট চাকুরী নেন। তিনি তাঁর বড় মামা হেদায়েত আলীর জ্যেষ্ঠ কন্যা মোসাম্মৎ তাহেরউন্নেসা খাতুনকে বিয়ে করেন। ডাক বিভাগের স্বল্প বেতনভুক্ত চাকুরিজীবী কবি অভাব অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত করেও সারাজীবন কাব্যচর্চা অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন। স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় বসন-ভূষণ দিতে পারতেন না। কিন্তু তবুও তাদের সম্পর্ক ছিল মধুর ও গভীর।

একটি কবিতায় কায়কোবাদ তাঁর ছেলে মেয়ে প্রসঙ্গে বলেছেন-

পাঁচটি ছেলে পাঁচটি মেয়ে
ছিলো মোর ঘরে
দু'টি ছেলে স্বর্গে গেছে
একটি দেশান্তরে।

মহাকবি কায়কোবাদ অত্যন্ত অমায়িক স্বভাবের ও সহজ-সরল প্রকৃতির ছিলেন। জীবনাচরণে এবং কথা-বার্তায় সর্বত্র তাঁর এই সারল্য লক্ষণীয় ছিল। তিনি অতি সাধারণ ও সৎ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। চাকুরী জীবনে তিনি ধুতি ও সাদা পাঞ্জাবী পরতেন। পাঞ্জাবীর পকেটে রূপালী চেইনের একটি ঘড়ি থাকতো। অবসর গ্রহণের পর তিনি পায়জামা পাঞ্জাবী পরতেন। তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি বেশ লম্বা চওড়া ছিলেন। তাঁর গায়ের রং ছিল ফর্সা। গলার স্বর ছিল ভরাট। সব সময় হাসিখুশী থাকতেন।

ব্যক্তিজীবনে কবি নিরহংকার ও অকপট। কোন রকম শঠতা বা অসততার ঠাঁই ছিল না তাঁর চরিত্রে। তিনি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহর প্রতি ছিল অগাধ বিশ্বাস। বিনয় ও কৃতজ্ঞতাবোধ কায়কোবাদের চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

কায়কোবাদের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ মোট ১৩টি। তন্মধ্যে বিরহ বিলাপ, কুসুম কানন, অশ্রুমালা, মহাশ্মশান, শিব-মন্দির ও জীবন সমাধি কাব্য, অমিয়ধরা, মহররম শরিফ বা আত্মবিসর্জ্জন কাব্য এবং শ্মশান-ভস্ম এই আটটি কাব্যগ্রন্থ কবির জীবতাবস্থায় প্রকাশিত হয়। প্রেমের ফুল, প্রেমের রাণী, প্রেম পারিজাত, মন্দাকনী ধারা এবং গওছ পাদের প্রেমকুঞ্জ, এই পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

কায়কোবাদ চাকুরীজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর স্থায়ীভাবে নিজ গ্রাম আগালায় বাস করতেন। তবে অধিকাংশ সময় আগালায় এবং মাঝে মধ্যে কলকাতায় ও ঢাকায় কাটিয়েছেন। শেষ জীবনে তিনি দৃষ্টি শক্তিহীনতাসহ নানা রোগে ভোগেন।

www.phulkuri.org.bd

১৯৫১ সালে ১৮ জুন তিনি আগালায়ে নিজ বাড়িতে রক্ত আমাশয় রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবস্থা খারাপ হলে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবশেষে মহাকবি কায়কোবাদ ২১শে জুলাই ৯৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

শেষ বয়সে কবি তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাকে উৎসর্গ করে একটি কবিতায় লিখেন-

তোমার চেষ্টায় বন্ধু পাকিস্তান গবর্ণমেন্ট
মঞ্জুর করেছে মাসে
পঁচাত্তর টাকা
তাই খেয়ে বেঁচে আছি নানা রোগে ভুগিতেছি
নতুবা এ জীবন বন্ধু
নাহি যেত রাখা।
দারুণ দারিদ্র বেশে চিকিৎসা চলে না মোর
পাইতাম বন্ধু
চলে গেলে
দুঃখ সহে না আর
প্রাণ করে হাহাকার
জানি না বিধাতা কবে
করিবে আহ্বান।

www.phulkuri.org.bd

বিদ্রোহী কবি নজরুল

মস্ত এক দীঘি। নাম তার পীরপুকুর। এই পুকুর পাড়ে একটি মসজিদ। মসজিদের ইমাম কাজী ফকির আহমদ। জমি-জমা বলতে বিশেষ কিছু নেই। দরগাহের খাদেমগিরি আর মসজিদে ইমামতি করেই তাঁর সংসার চলে। তাই অভাব অনটন ছিলো তাঁর নিত্য সাথী। লোকে বলে, পাটনার হাজীপুর গ্রামে নাকি ছিল তাঁদের আদিবাস। ওখান থেকে এসে তাঁরা চুরুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করে।

কাজী সাহেবের কোন সন্তান বাঁচতো না। একে একে তাঁর চার চারটি সন্তান জন্মের পর মারা যায়। তাই তাঁর দুঃখের শেষ নেই। তবুও মসজিদের মিনার হতে খুব ভোরে তাঁর কণ্ঠে আজানের সুর ভেসে আসে। থরথর করে কেঁপে ওঠে গাছের পাতা। তারপর কোন এক সময় পুকুরের ছোট্ট ঢেউ ভাঙ্গা পানিতে মিশে যায় সেই সুর।

এক এক করে চলে যায় অনেকগুলো বছর। ফিরে এলো ১৮৯৯ সালের ২৪মে। গভীর রাত। নীরব নিথর সারাটা পৃথিবী। কাজী সাহেবের সংসারে এলেন তাঁর পঞ্চম সন্তান। দুঃখে কাজী সাহেবের মুখ মলিন। কারণ এই

www.phulkuri.org.bd

সন্তানকেও যদি বাঁচাতে না পারেন। বাবার দুঃখের দিনে জন্মেছে, তাই তো নাম হলো তার দুখু। মা জাহেদা খাতুন শিশু দুখুকে আদর-যত্নে মানুষ করতে লাগলেন। বাবা-মার চোখের মণি দুখু মিয়া ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলেন।

বাবা তাঁকে গ্রামের মক্তবে ভর্তি করে দিলেন। মক্তবে তিনি আরবী ফার্সি শিখতে লাগলেন। লেখাপড়ায় তিনি খুব ভাল ছিলেন। একবার যা পড়তেন, সেটা খুব সহজেই মনে রাখতে পারতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ডানপিটে। কোন বাধাধরা নিয়ম তিনি মানতে পারতেন না। গ্রামের দুষ্টু ছেলেদের সর্দার ছিলেন বলে এ বাড়ির আম, ও বাড়ির লিচু চুরিতে তার জুড়ি ছিল না। তার এসব দুরন্তপনায় কিন্তু গ্রামের লোকেরা মোটেও বিরক্ত হতেন না। তিনি ডাগর ডাগর চোখে ঝাঁকড়া কোকড়া চুল আর মিষ্টিমাখা হাসি দিয়ে সবার মন জয় করে নিতেন।

নজরুলের বাবা ছিলেন খুবই পরহেজগার। ইবাদত বন্দিগিতে সারাক্ষণ মসগুল থাকতেন। ছেলেকে মক্তবে দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত। আর সবার মতো তাঁর ছেলেও মানুষ হবে। ক্রমে তাঁর বয়স হলো আট বছর। আর সেই সময় হঠাৎ বাবা পরপারে চলে গেলেন।

স্বামীর হঠাৎ ইন্তেকালে মা জাহেদা বিপদে পড়ে গেলেন। গরীবের সংসার। কিভাবে সংসার চালাবেন? কিন্তু তিনি ভেঙ্গে পড়লেন না। ছেলের মুখ চেয়ে সাহসে বুক বাঁধলেন। এরমধ্যে নজরুলও প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করলেন।

বয়স মাত্র দশ বছর। সংসার অচল। অভাবের তাড়নায় লেখাপড়া বন্ধ। সংসারের জন্য তিনি মক্তব্যে চাকুরী শুরু করেন। বয়স কম বলে এই চাকুরী বেশি দিন করতে পারলেন না।

তাই তো গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন শহরে। আসানসোলের এক রুটির দোকানে চাকরি নিলেন। সেখানে খুব ভোরে উঠে তাঁকে আটা মাখতে হতো। মাইনে ছিলো কত জানো? মাত্র এক টাকা। তাতেই তিনি খুশী। এই রুটির দোকানে এসে নজরুলের লেখাপড়ার দিকে আবার ঝোঁক চাপলো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি পড়তে বসে যেতেন। সঙ্গীরা ঠাট্টা করে তাঁকে পাগল বলতো। ভবিষ্যতে কবি হওয়ার কথা শুনে অবজ্ঞার হাসি হাসতো। এক সময় চাকরী আর ভাল লাগলো না। আবার পড়া শুরু করলেন। দরিরামপুর ও রানীগঞ্জ সিয়ারসোল হাইস্কুলে তিনি পড়াশুনা করেন। সাথে সাথে কবিতাও লিখতেন।

কবি দশম শ্রেণীর ছাত্র। সেই সময় সারা দুনিয়া জুড়ে আরম্ভ হলো প্রথম মহাযুদ্ধ। সেই যুদ্ধের ডামা-ডোলের ঢেউ এসে লাগলো এই উপ-মহাদেশেও। তরুণ নজরুল আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। একদিন কাউকে কিছু না

www.phulkuri.org.bd

বলে চলে গেলেন করাচীতে। ৪৯ নম্বর বাংগালী পল্টনে যোগ দিলেন। পল্টনে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। যার ফলে তিনি সহজেই হাবিলদার পদে প্রমোশন পান।

১৯১৯ সালে যুদ্ধ শেষ হলো। দলে দলে সৈনিকেরা ঘরে ফিরতে লাগলেন। নজরুলও একদিন ফিরে এলেন কলকাতায়।

ঐ সময় এ.কে. ফজলুল হক 'নবযুগ' নামে একখানি পত্রিকা বের করেন। তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

তারপর এক এক করে চলে গেলো অনেকগুলো বছর। কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন তিনি। তাঁর কলম গেলো থেমে। মুখের ভাষা স্তব্ধ হলো। প্রায় ৩৬ বছর কবি এভাবে বেঁচে ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরে থাকতেন। স্বাধীনতার পর এলেন বাংলাদেশে। বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা পেলেন তিনি।

আজ থেকে মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাকার পি.জি. হাসপাতালে তিনি পরপারে যাত্রা করেন। কবি তাঁর মৃত্যুর কথা মনে করেই হয়তো একদিন লিখেছিলেনঃ

"মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই॥
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজীরা যাবে।
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে।
গোর আজাব থেকে এ গুনাহগার পাইবে রেহাই॥"

তাইতো কবির ইচ্ছা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়। তোমরা সেখানে গেলেই কবির কবর দেখতে পাবে।

www.phulkuri.org.bd

পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীন

"আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
ফুল তুলিতে যাই
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ি যাই।"

বন্ধুরা এ মজার ছড়াটি কে লিখেছেন জানো? হ্যাঁ, তা হলে শোন। যে কবি তোমাদের জন্য পল্লীগাঁয়ের কথা সুন্দর করে ছন্দের পর ছন্দ দিয়ে সাজিয়ে ছড়া কবিতা আকারে উপহার দিয়ে গেছেন তাঁর কথাই তোমাদেরকে বলছিলাম। আর এ জন্যেই তাঁকে পল্লীকবি বলা হতো। তা হলে অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারছো কে এই কবি। তিনি হলেন আমাদের প্রিয় পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন।

ধানক্ষেতের নরম বুকের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝিরঝির বাতাস আর রূপালী নদীর কলকল শব্দের মাঝে কবি জসীমউদ্‌দীন খুঁজে পেতেন কবিতার ছন্দ। ডানকানা মাছের কিলবিলে সাঁতার আর উদোম গায়ে গ্রাম্য কিশোরের এলোমেলো দুষ্টমী তাঁকে যেন ডেকে নিয়ে যেতো ছেলেবেলার সেই দিনগুলোতে। হারাধন ঘোষ যখন দইয়ের ভাঁর কাঁধে নিয়ে হেঁটে যেতো পাড়ায় পাড়ায়, বলরাম মিস্ত্রী যখন তুক তাক্ মন্তর পড়ে ধ্যান করতো চোখ বুঁজে, যখন পুকুর ভরা মাছ ছিলো আর গোলা ভরা ধান-সেই দিনগুলো কবির মনে

www.phulkuri.org.bd

পড়তো। তাই কবি সোনালী ধানের লকলকে শীষ, ডালিম গাছের ফুল আর সোজন বেদের বাউল টানের মাঝে খুঁজে বেড়াতেন তাঁর গাঁয়ের নির্মল দিনগুলোকে।

আচ্ছা তোমরা কি কখনো গ্রামে বেড়াতে গিয়েছো? গ্রামে গাছে গাছে যখন পাখি ডাকে তখন তোমাদের কেমন লাগে? খুব মজা, তাই না? মন উদাস করা ভরদুপুরে বেতুন ঝোঁপের আড়ালে বসে যে পাখিটি একটানা ডেকে চলে, লেবু রংঙের রোদ্দুরের সঙ্গে ঝিলমিল করে হেসে ওঠে যে শিশির বিন্দুটি, কবি তাদের না বলা কথাগুলো হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। অজপাড়া গাঁয়ের প্রতিটি মানুষ যেনো তাঁর অতি নিকটজন ছিলো। তারা যেন সবাই কবির আত্মার আত্মীয়। ফলে কবি জসীমউদ্‌দীন তাঁর প্রতিটি রচনার মধ্য দিয়ে পল্লীর সাধারণ মানুষের জীবন কবিতার মাধ্যমে নিখুঁতভাবে এঁকে গেছেন।

তাহলে চলো না এ কবি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন তা আমরা জেনে নিই। ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রাম। এই গ্রামেই ১৯০৩ সালের পহেলা জানুয়ারি কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্রজীবন কাটে ফরিদপুর আর কলকাতায়।

দুষ্টুমী করতে কেমন লাগে? খুব মজা, তাই না! হ্যাঁ, ছেলেবেলায় আর দশটি কিশোরের মতো কবিও ভীষণ দুষ্ট ছিলেন। যেমন একটা ঘটনা বলছি- স্কুল থেকে কবির বাড়ি ছিলো প্রায় আড়াই মাইল দূরে। সেখান থেকে তিনি খাওয়া-দাওয়া সেরে নয়টার সময় স্কুলে রওয়ানা করতেন। আর স্কুল ছুটি হতো বিকাল চারটার সময়। এরমধ্যে কবির পেটে খুব ক্ষুধা লাগতো। একদিন করলেন কি, পেটে ক্ষুধা পেলে নিজের পাঠ্যবইগুলো বাটা দিয়ে দুই আনার বরফি কিনে খেলেন। কিন্তু বই ছাড়িয়ে নেয়ার পয়সা কোথায় পাবে? এবার তো খুব চিন্তা। কয়দিন পর বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে বাজারে বিক্রি করে পয়সা সংগ্রহ করলেন। তারপর গেলেন দোকানীর কাছে। দোকানী বললেন, আমি তোমাকে না দেখে বইগুলো ছিড়ে ঠোঙা বানিয়ে বিক্রি করে দিয়েছি। এ কথা শুনেতো কবির মাথায় হাত।

ছেলেবেলা থেকেই কবি ছিলেন দারুণ মিশুক প্রকৃতির। শুধু নিজ গ্রামই নয়, আশপাশের অন্যান্য গ্রামের লোকেরাও তাঁকে ভালবাসতেন।

কবির কাব্যচর্চা কখন শুরু হয় জানো ? রবীন্দ্র যুগের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর কাব্যচর্চা শুরু হয়। সে যুগের কবিদের মধ্যে যতীন্দ্র মোহন বাগচী, কালীদাস রায়, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক ও করুণা নিধি বন্দোপাধ্যায় ছাড়াও আরও কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক তাদের লেখায় গ্রামীণ জীবনকে উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু তারা কেউই জসীমউদ্‌দীনের মতো এমন অন্তর দিয়ে পল্লীর আলো বাতাসকে ভালবাসতে পারেননি।

বাংলাসাহিত্যে জসীমউদ্‌দীন এক দুর্লভ প্রতিভা। গ্রাম বাংলার নির্মল পরিবেশ দিয়ে আমরণ ছন্দের মালা গেঁথে গেছেন তিনি। তিনি কখনো কাউকে অনুসরণ

www.phulkuri.org.bd

করতেন না। তবে অগ্রজদের উপদেশ গ্রহণ করতেন।

একবার বাড়ি থেকে কবি কয়েকটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে কলকাতায় চলে গেলেন। তাঁর ইচ্ছা কবি নজরুলকে দেখানো। এই সুবাদে কবি নজরুলের সাথে পরিচয়ও হয়ে যাবে। তাই তিনি গিয়ে হাজির হলেন। কবি নজরুল তখন বন্ধুদের সাথে গল্পের আসরে ছিলেন। জসীমউদ্‌দীন ভয়ে ভয়ে নজরুলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। নজরুল দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, তুই কে রে? তিনি বললেন, আমার নাম জসীমউদ্‌দীন। আমি ফরিদপুর থেকে এসেছি আপনার সাথে দেখা করতে। এই বলে কবিতার পাণ্ডুলিপিগুলো নজরুলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। কবি নজরুল ২/১টি পাতা উল্টিয়ে বললেন, আমি এখন বাইরে যাচ্ছি তুই পরে আসিস। জসীম উদ্‌দীন চলে এলেন। কবি নজরুল বাসায় ফিরে জসীমউদ্‌দীনের কবিতাগুলো পড়লেন। তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মনে মনে জসীমউদ্‌দীনকে খুঁজতে লাগলেন। একদিন জসীমউদ্‌দীন গিয়ে হাজির হলেন নজরুলের কাছে। নজরুল দেখেই জসীমউদ্‌দীনকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুই এতো সুন্দর কবিতা লিখিস ! তারপর তিনি পরামর্শ দিলেন, গ্রামকে নিয়েই লিখতে হবে তোকে, ভালো করতে পারবি। এভাবে জসীমউদ্‌দীন নজরুলের ভালোবাসা কুড়িয়ে নিলেন। আরো নিবিড়ভাবে মিশতে লাগলেন গ্রামীণ পরিবেশের সাথে।

কবি জসীমউদ্‌দীন শুধু বড় কবিদের নয়, বরং প্রতিটি মানুষের মন কেড়ে নিতে পারতেন। তাই জসীম উদ্‌দীন ছিলেন একটি নতুন ধারার বাহক। যে ধারাটি ধীরে ধীরে কবিকে নির্ভেজাল পল্লীকবির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি চলে গেলেন রহিমুদ্দীর ছোট্ট বাড়ীতে আসমানীকে দেখতে। আর আসমানীদের কথা ছড়িয়ে দিলেন তোমাদের কানে কানে। কতো সুন্দর করে ছন্দের মালা সাজিয়ে উপহার দিলেন তোমাদের মতো ছোট্ট বন্ধুদের।

কবি জসীমউদ্‌দীন ১৯৩১ সালে বাংলাসাহিত্যে এম, এ পাশ করেন। ১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগ দেন। ১৯৬২ সালে অবসর গ্রহণ করার পর থেকেই তিনি নিজেকে বিলিয়ে দেন পল্লীসাহিত্য সংগ্রহ ও রচনার কাজে। তখনকার দিনের খ্যাতনামা শিশু কিশোর পত্রিকা "শিশু সাথী", "মৌচাক", "রামধনু", "সন্দেশ", "আলাপন" প্রভৃতিতে অনেক অনেক ছড়া-কবিতা লিখেছেন তিনি।

শুধু কি তাই? 'হাসু', 'এক পয়সার বাঁশি', 'ডালিম কুমার', 'হীরামন', 'বাঙালীর হাসির গল্প' প্রভৃতি সুন্দর বই লিখে ছোটদের হৃদয়-মন জয় করে নিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের গ্রাম, মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি ছড়ায়, কবিতায়, গানে এবং নাটকে। গ্রামের শস্য-শ্যামল প্রাকৃতিক পরিবেশ শৈল্পিক সুষমায় অতি নিপুণভাবে রূপায়িত হয়েছিল তাঁরই হাতে।

www.phulkuri.org.bd

কবি কতগুলো বই লিখেছেন জানো? বাব্বাহ! পঁয়ত্রিশটি বই তিনি লিখেছিলেন। যেমন ধর, রাখালী, নকসী কাঁথার মাঠ, ধানক্ষেত, সোজন বাদিয়ার ঘাট, সকিনা, যে জননী কান্দে, বালুচর, স্মৃতিপট, মাটির কান্না, রূপবতী, সুয়েনী, বোবাকাহিনী, রঙ্গীলা নায়ের মাঝি, চলে মুসাফির, গাঙের পাড়ি, বেদের মেয়ে, মধুমালা, পল্লীবধূ, গ্রামের মায়া ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনায়, যাঁদের দেখেছি, জীবন কথা, যে দেশের মানুষ বড়, হলদে পরীর দেশে, জার্মানির শহরে বন্দরে, ওগো পুষ্পধনু ও ভয়াবহ এই দিনগুলো উল্লেখযোগ্য। কবি জসীমউদ্‌দীনের লেখা শেষ গ্রন্থটি কি জানো? শেষ গ্রন্থটির নাম হলো-'মাগো জ্বালিয়ে রাখিস আলো'।

পল্লীকবি জসীমউদ্দীন ছিলেন এমন এক মরমী কবি যাঁর কাজের সাথে জড়িয়ে ছিলো সবুজ মাঠ, লাউয়ের ডগা, বাঁশপাতার শন শন শব্দ আর পবন মাঝির ভাটিয়ালী গান।

কবি তাঁর লেখার সাথে বাস্তবতাকে মেখে ফেলতেন। তোমরা তার 'কবর' কবিতা নিশ্চয়ই পড়েছ। এই কবিতাটি তিনি যখন বি এ ক্লাসের ছাত্র তখনই লিখেন। এই কবিতাকে নিয়ে একটা গল্প আছে। একদিন নাকি কবি এক খোলা বিলের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন বিলের মাঝখানে এক বাড়ি থেকে এক বৃদ্ধের কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। অমনি কবি ঐ বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। গিয়ে দেখলেন, বৃদ্ধ তার এক নাতীকে সামনে নিয়ে বিলাপ করে কাঁদছে। কবি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন আর কেউ নেই। বাড়িটি তাঁর কাছে শূন্য মনে হলো। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন বাবা? বৃদ্ধ বললেন, আমার এই বাড়িতে অনেক লোক ছিল। কিন্তু কলেরা রোগ হয়ে সবাই মারা গেছে, শুধু আমি আর আমার এই নাতী ছাড়া আর কেউ নেই। কবি বৃদ্ধের বিলাপে বিস্তারিত জেনে বাড়ি এলেন। তারপর লিখা হয়ে গেলো কবির বিখ্যাত কবিতা 'কবর'।

"এইখানে তোর দাদীর কবর
ডালিম গাছের তলে
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি
দুই নয়নের জলে।"

বাহ! কি মজার কবিতা তাই না!

বাংলার মাটি ও মানুষের মনে যতোদিন পল্লীর এই মায়াঘেরা নির্মল পরিবেশটি সুর ছড়িয়ে যাবে কবির এই সুন্দর মিষ্টি আবেদনও আমাদের মাঝে ততোদিন বেঁচে থাকবে।

কবি জসীমউদ্‌দীন আজ আর আমাদের মাঝে নেই। ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ আমাদের পল্লীর এই প্রিয় কবি চলে গেছেন এই দুনিয়া ছেড়ে। মৃত্যুর মাত্র বাইশ দিন আগে তিনি রাষ্ট্রীয় একুশে পদক পান।

www.phulkuri.org.bd

কবি ফররুখ আহমদ

একটি বালক। হালকা পাতলা শরীর। চোখ থেকে যেন আগুন ঝরে। বুকে তার দুরন্ত সাহস, ফরফর করে উড়তো মাথার চুল। অনেক অনেক ভাবনা তাঁর। যেন সে এক গহীন রাজ্যের রাজকুমার। তাঁর ছিল হরেক রকম পাখি। এক বিশাল বাগান। বাগানে নানা রকম গাছা গাছালি। সেই বাগান থেকে মউ মউ গন্ধ আর হীম শীতল বাতাস বইতো। পাখিরা কুহু কুহু তানে ভরিয়ে দিতো সমস্ত বাগান। তাঁর ভাবনায় সে পঙ্খিরাজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে টগবগ করে কত মাঠ-ঘাট পেরিয়ে হাজির হতো হাতেমতায়ীর দেশে।

গভীর রাত। মাস্তুল ধরে বসে আছেন নাবিক। মাঝি দাঁড় টানছেন। করকর দাঁড় টানার শব্দ। দূর থেকে ভেসে আসছে ভাটিয়ালি গানের সুর। সমস্ত আকাশ মেঘে ঢেকে আছে। শেষ গন্তব্যস্থলে যেতে হবে তাঁকে। ঢেউয়ের দেওয়াল ভেঙে ভেঙে নৌকা এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। বার বার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছেন, কখন সকাল হবে। কিন্তু এখনো যে রাত পোহাবার অনেক দেরী। থামলে চলবে না, গন্তব্যস্থলে পৌঁছতেই হবে। এমনি হলো সে বালকের ভাবনা।

www.phulkuri.org.bd

এতক্ষণে হয়তো সবার মনে প্রশ্ন জেগেছে, কে সেই বালক। কি নাম তার? মধুমতি নদী। এই নদীর তীরে ছায়াঢাকা পাখি ডাকা ছোট্ট একটি গ্রাম। নাম তার মাঝআইল। এই মাঝআইল গ্রামে ১৯১৮ সালের ১০ জুন তাঁর জন্ম। বাবার নাম খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী, মা বেগম রওশন আক্তার। দাদী আদর করে নাম রাখেন রমযান। রমযান মাসে জন্মেছেন বলেই দাদী রমযান বলে ডাকতেন। বাবা নাম রাখেন সৈয়দ ফররুখ আহমদ। আচ্ছা বন্ধুরা বলতে পারো- ফররুখ অর্থ কি? ফররুখ অর্থ হলো সৌভাগ্যবান। তিন মেয়ের পর ছেলে, বাবার মনে তখন খুশীর বান ডেকেছিল। তাইতো তিনি এই নাম রাখেন। আর সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি হলেন তোমার আমার সবার প্রিয় কবি ফররুখ আহমদ। সবার যিনি কবি তাঁর কথা কে না শুনতে চায়, কে না জানতে চায় তাঁর জীবনের মজার মজার কথা। এবার তা হলে আমরা জেনে নেই সে কবির ছোটবেলার কথা গুলো।

ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছেন কবি। স্নেহ-প্রীতির মধ্য দিয়ে দিন পেরিয়ে মাস, তারপর বছর। বয়স মাত্র ছ'বছর। তখন থেকেই কবির দুঃখের শুরু। মার কোমল আদর থেকে বঞ্চিত হলেন তিনি।

তারপর, মা হারা ছেলে দাদীর কোলে মানুষ হতে লাগলেন। সব সময় দাদীর কাছেই থাকতেন। রাতে শুয়ে শুয়ে দাদীকে নানা প্রশ্ন করতেন। দাদী ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করতেন। এই দুরন্ত বালকের চোখে কি ঘুম আসে? তাঁর ইচ্ছা অনেক কিছু জানার, অনেক কিছু শুনার। অবশেষে দাদী তাজকেরাতুল আউলিয়া, কাসাসুল আম্বিয়া, নওফল বাদাশাহ, হাতেমতায়ী ইত্যাদি গল্প শুনাতেন। দাদী ছিলেন শিক্ষিতা মহিলা। তাইতো দাদীর কাছেই কবির লেখাপড়া হাতে খড়ি। এর পর মাঝআইল গ্রামের মোল্লাজি আবদুস সামাদের পাঠশালাতেই কবির শিক্ষাজীবন শুরু।

ছোটবেলা থেকেই কবি আপনভোলা ছিলেন। পথ চলতে চলতে মাথা নাড়তে নাড়তে যেতেন। রাতে খুব একটা ঘুমোতেন না। কত আজব চিন্তা-ভাবনা করতেন তিনি। যা শুনলে সত্যিই হাসি পায়।

একদিন সকাল বেলা, কবিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সবাই খোঁজা খুঁজি করছে। কোথায় গেলো? পরে দেখা গেলো, চৌকির তলায় মুরগীর বাচ্চা দেখছে। বড় ভাই জিজ্ঞেস করতেই বলে উঠলেন, 'মুরগীর বাচ্চা দেখতে ভাল লাগে তাই দেখছি।

আর একদিন, দাদীজান সকাল বেলা তার বিছানা ভরা ভাঙ্গা ডিম দেখতে পেলেন। হ্যাঁরে রমযান ডিম কোত্থেকে এলো? জবাবে কবি বলে কি জানো? পিঠের তলায় দিয়ে শুয়েছিলাম বাচ্চা ফোটাবার জন্যে।

www.phulkuri.org.bd

লম্বা পিরহানের জেবে কলসি ভাঙ্গা চাঁড়া, কড়ি, এসব ভরে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ করতেন। হাঁকতেন হিং নেবে হিং, আংগুর, কিসমিস, পেস্তা, খুরমা, বাদাম। আর কাবলীওয়ালা সেজে ছড়া কাটতেন ঃ

সুলতান যাবে কাবুল দেশে
পেস্তা বাদাম খাবে ঠেসে।

কবির বাবা ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর। তিনি থাকতেন কলকাতায়। এক সময় কবি ও বাবার সাথে কলকাতায় চলে যান। কবি সেখানে তালতলা মডেল স্কুল ও বালিগঞ্জ হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন। কবি গোলাম মোস্তফা, আবুল ফজল, আবুল কাশেম, বুদ্ধদেব বসু এদের নাম হয়তো তোমরা শুনেছো। এরা ছিলেন কবির শিক্ষক। আর বন্ধু কারা ছিলেন? সত্যজিৎ রায়, ফতেহ লোহানী এরা ছিলেন কবির বন্ধু।

ফররুখ ছিলেন কবি অসংখ্য কবিতা লিখেছেন তিনি। ছোটদের বড়দের সবার মনের মত করেই লিখতেন। তাঁর ছোটদের জন্য লেখা কবিতাগুলো তোমরা পড়েছো? তাঁর জীবনের অনেক কথাইতো জানলাম, আসো না তাঁর মজার মজার কবিতাগুলো এবার চেখে দেখি।

যখন যে ঋতু আসতো তখন সেই ঋতুকে নিয়েই কবিতা লিখতেন। গরমের কথা ধরো। মাত্র কয়দিন আগেইতো খুব গরম পড়েছিল। সারা দেশে কি হাহাকার নেমেছিল। সামান্য বৃষ্টির জন্য মানুষ আল্লাহর কাছে কত কান্নাকাটি করেছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম। তখন দেখেছি গরমের দিনে চাষিরা টালা মাথায় দিয়ে হাল চাষ করতো। রাতের বেলায় উঠোনে বসতো মা-চাচিদের গল্প গুজবের আসর। বাহির বাড়ীর পুকুরপাড়ে পুরুষেরা জমাতো পুঁথির আসর। গ্রামের ছেলেমেয়েরা দিনের বেলায় বাড়ি বাড়ি খুদমাগুনী করে চাউল তুলে আনতো। তারপর মাথায় কুলা নিয়ে তার উপর পানি ঢেলে পিছলা কাটতো। কবি ওসব নিয়ে লিখেন-

নামলো খরা ভাটির দেশে
বেড়ায় না কেউ খেলে হেসে
আয় ভেসে মেঘ কালা-ধলা
শুকায় কাগা বগার গলা
যায় শুকিয়ে নদীনালা
আয় ভেসে মেঘ কালা-ধলা।

যখন বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা কাশফুলগুলোকে ভিজিয়ে দিত, বৃষ্টির তোড়ে তখন কাশের বন কাঁপতো। বকেরা তখন বাঁশপাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়তো, তিনি তা

www.phulkuri.org.bd

জানিয়ে দিলেন সবাইকে-

বিষটি এল কাশবনে
জাগলো সাড়া ঘাসবনে
বকের সারি-কোথারে
লুকিয়ে গেলো বাঁশবনে।

ঝম ঝম বৃষ্টির শব্দ থেমে গিয়ে রোদের আলো যখন ঝলকে উঠতো তখন কবি ঘর থেকে বের হতেন। পা টিপে টিপে তিনি পাখির বাসা খুঁজতেন। যাওয়ার সময় সাথীদেরকেও ডেকে যেতেন-

আয়গো তোরা ঝিমিয়ে
পড়া দিনটাতে
পাখীর বাসা খুঁজতে
যাবো এক সাথে।

পুকুর পাড়ের তালগাছটির নিচে গিয়ে দাঁড়াতেন কবি। বাবুই পাখিরা বাসা গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতেন। বাতাসে ঝুলছে বাসাগুলো, পাশেই একটি গাছে টুনটুনিটা কিচির মচির ডাকছে। কবি কি ভাবতেন জানো, তিনি ভাবতেন? বৃষ্টি থেমে যাওয়াতে টুনটুনিটা আনন্দে গান ধরেছে বুঝি। তাইতো তাদের সাথে তিনিও শরীক হতেন। হাটতে হাটতে গানের সুর ভাজেন-

আয়গো তোরা ঝিমিয়ে
পড়া দিনটাতে
পাখীর বাসা খুঁজতে
যাবো একসাথে।।

পুকুরপাড়ের তালগাছটির নিচে গিয়ে দাঁড়াতেন কবি। বাবুইপাখিরা বাসা গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতেন। বাতাসে ঝুলছে বাসাগুলো, পাশেই একটি গাছে টুনটুনিটা কিচির মিচির ডাকছে। কবি কি ভাবতেন জানো? তিনি ভাবতেন, বৃষ্টি থেমে যাওয়াতে টুনটুনিটা আনন্দে গান করছে বুঝি। তাইতো তাদের সাথে তিনিও শরীক হতেন।

টুনটুনিকে ভিজিয়ে দিয়ে
বৃষ্টি নামে রিম ঝিমিয়ে
কয় সে কথা অচিন দেশের
গানের ভাষাতে।

www.amarboi.org

বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে মাঠে মাঠে কেমন গরম জানো? এই গরমে আম কাঁঠাল পেকে যায়। কবি আম বাগানে যেতেন আম কুড়াতে।

আম বাগানে যাই ছুটে যাই
কাঁচা আমের সোয়াদ যে পাই
ক'দিন পরে পাকবে রে ভাই
লাল গোলাপী ডুরে।

কি আম খেতে ইচ্ছে করছে বুঝি? কবির কথা মিথ্যা নয়। গরমে কাঁচা আম মন্দ লাগে না।

আসল কথা কি, ঘরের কোণে বসে থাকা কবি মোটেও পছন্দ করতেন না। তাই তো তিনি সবাইকে ঘর থেকে বের হয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। অচেতন মানুষগুলোকে ডেকে বলেন।

সবাই যখন ঘরের কোণে
ঝিমায় বসে সংগোপনে
শাহীন তখন হাওয়ায় সওয়ার
পাখনা মেলে দেয় লঘু ভার।

কবি সব কিছুকে নিয়েই লিখেছেন। শিশুদের জন্য কবি হরফের ছড়া লিখেন। এই ছড়াগুলোয় কবি বাংলার বিভিন্ন বর্ণমালার চিত্ররূপ অঙ্কন করেন।

ক-য়ের কাছে কলমিলতা
কলমিলতা কয় না কথা
কোকিল ফিঙে দূর থেকে
কলমি ফুলের রঙ দেখে।

'ঝ' নিয়ে লিখেন ঃ

ঝ-এর পাশে ঝিঙে
ঝিঙে লতার ফিঙে
ঝিঙে লতা জড়িয়ে গেলো
কালো গরুর শিঙে।

এবং

ব-য়ের কাছে বনবিড়াল
আনলো ডেকে সাত শিয়াল
বোল-বোল-বোল আমের বোল
বাদুড় এসে বাজায় ঢোল।

www.amarboi.org

কি সুন্দর ছড়া। কি মজার মজার কথা। কবির এই কথাগুলোকে আমাদের মনের সাথে মেখে নিলে কেমন হয়?

বড়দের জন্য কবির প্রথম কবিতার বই 'সাত সাগরের মাঝি' বইটা প্রকাশ পেতেই তাঁর কবিনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

তারপর এক এক করে অনেকগুলো বছর চলে গেলো। তাঁর সৃষ্টি সম্ভার বাড়লো। কিন্তু কবির দুঃখ দূর হলো না। এত বড় কবি অথচ রেডিওর সামান্য একটা চাকরীই তাঁর আয়ের একমাত্র উৎস। অনেক টানাটানিতে চলতো তাঁর সংসার। সাদা পায়জামা আর পাঞ্জাবী ছিল তাঁর পোশাক। মাঝে মাঝে শেরোয়ানী পরতেন। পোশাকে তালি দিতেন। সত্যের পথে ছিলেন আপোষহীন, চরম দুর্দিনেও তিনি কারো কাছে হাত পাতেননি। কষ্টের কথা কারো কাছে তিনি প্রকাশ করতেন না। নিজের মনের কাছে তিনি ছিলেন অপরাজেয়। রমযান মাসে মাথা উঁচু করে যে কবিটি আমাদের মাঝে এসেছিলেন, মাথা উঁচু রেখেই আরেক রমযান মাসে রোজা মুখে নীরবে নিঃশব্দে তিনি চলে গেলেন দূরে বহু দূরে। তাঁর মৃত্যুর সেই তারিখটা হলো ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর।

www.amarboi.org

প্রিয় মানুষ প্রিয় কবি

বৃক্ষের পরিচয় যেমন ফলে, একজন কবির পরিচয় তেমনি তাঁর কবিতায়। তাঁর ভাবে, বিষয়ে, বিন্যাসে। তোমাদেরকে যে মানুষটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই তাঁর পরিচয়ও তাঁর কবিতায়। যেমন একটি কবিতায়-

তোমার যখন হাঁটি হাঁটি
একটু একটু পায়ের চলা,
তোমার যখন ভাঙা ভাঙা
একটি দু'টি শব্দ বলা।

তোমার যখন প্রথম হাসি
মেঘ সরিয়ে আলোক জ্বলে,
তোমার নতুন চেয়ে দেখায়
ফুলগুলো সব কথাই বলে।

এখন সবাই আনন্দিত
বলে সবাই চাঁদ নেমেছে-
আকাশ থেকে মাটির বুকে
রাতের বেলা দীপ হেসেছে।

আমি এখন তোমার দিকে
হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসি
তুমি আমার নয়ন তারা
খুশীর গাঙে বান ডেকেছে।

www.amarboi.org

ওপরের কবিতাংশ থেকেই আমরা তাঁকে চিনে নিতে পারি। তাঁর মনোজগৎ, তাঁর দৃষ্টিকোণ, তাঁর প্রকাশভঙ্গীতে সব কিছুর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মুখের হাসি আর বুকের ভালোবাসাকে মনের রঙে রাঙিয়ে দেয়ার প্রয়াসী তিনি। যে প্রিয় মানুষটির কথা তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি, তিনি হলেন আমাদের প্রিয় মানুষ, প্রিয় কবি সৈয়দ আলী আহসান।

সৈয়দ আলী আহসান একজন বড় কবি, বড় মানুষ। তাঁর অজস্র লেখা। তিনি বড়দের জন্য যেমন লিখেছেন, তেমনি ছোটদের জন্যও তাঁর সাহিত্যের ভান্ডার কম নয়। তাঁর কথা, বাচনভঙ্গিই আলাদা। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন মনে হতো যেন প্রতিটি কথাই কবিতার পঙক্তিমালা। যেন ছন্দে ছন্দে দুলতে থাকতো তাঁর কথার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন'। তাঁর প্রবন্ধগুলো পড়লে মনে হয় যেন প্রতিটি লাইনই কবিতার লাইন। তাঁর লেখার মধ্যে যেমন ছিলো রোমান্টিকতা, তেমনি সারা বিশ্বের ইতিহাস, ঐতিহ্য সংস্কৃতিও ফুটে উঠতো। তাঁর লেখার মধ্যে বিশ্বের কোন না কোন দেশের কথা আসতোই। কারণ তাঁর অনেক জানা। সারা পৃথিবী চষে বেড়িয়েছেন তিনি।

এই বড় মানুষটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা প্রয়োজন। কি বলো, তাই না? হ্যাঁ বলছি, শোন।

১৯২২ সালের ২৬ মার্চ। যশোর জেলার আলোকদিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন সৈয়দ আলী আহসান। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আলী হামেদ, আর মাতার নাম সৈয়দা কামরুন্নেগার খাতুন। ৫ ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার বড়। বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে তাঁর হাতে খড়ি। ১৯২৬ সালে ধামরাই প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু।

তারপর ১৯৪১ সালে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় এসে আর্মানিটোলা স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৩৮ সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পাস করেন। তারপর ঢাকা কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্মজীবনে সৈয়দ আলী আহসান ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, অল ইন্ডিয়া রেডিও, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৮২ সালে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি হিসাবে যোগদান করেন।

তাঁর প্রথম লেখা কোথায় ছাপা হয় জানো? ১৯৩৭ সালে স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা প্রথম একটি ইংরেজি কবিতা ছাপা হয়। ১৯৪০-৪৪ সালের মধ্যে তিনি গল্প,

www.amarboi.org

উপন্যাস লেখা আরম্ভ করেন। তখনকার গল্পগুলোর শিরোনাম হলো-বুদ্বুদ, তারা তিনজন, রহীমা, জন্মদিন ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব লেখা তৎকালিন মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাতে ছাপা হয়। তাঁর লেখা প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ১০৫টি।

সৈয়দ আলী আহসান পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করেন। আমার মনে হয় সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ানো তিনিই একমাত্র কবি।

তিনি দেশ-বিদেশ থেকে অগণিত পুরস্কার লাভ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্বাধীনতা স্বর্ণপদক, একুশে পদক, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক ও মাইকেল মধুসুদন সাহিত্য পুরস্কার উল্লেখযোগ্য।

কবি সৈয়দ আলী আহসান নীল রং পছন্দ করতেন। তবে সাদা রঙের কাপড় তিনি বেশী ব্যবহার করতেন।

সব ধরনের খাবারই তাঁর প্রিয়। তবে বিশেষ পছন্দ ছিলো বিরিয়ানী, পরোটা, কাবাব, পাঙ্গাশ মাছ, শোল মাছ ও বড় কৈ মাছ।

সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন একজন ভাবুক মানুষ। অন্ধকার রাতে মাঠে বেরিয়ে এসে শীতল বাতাসের প্রশ্রয়ে নক্ষত্র খচিত নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে স্রষ্টার সাথে কথা বলতেন। তাঁর ভাষায় "হে প্রভু, অসহায় আমি/তোমার সৃষ্টির বিপুল বিস্তার দেখে আনন্দে আপ্লুত। এবং তোমার অস্তিত্বের কাছে আমি 'আমার নিজকে সমর্পণ করছি।' যার ফলে গত ২০০২ সালের ২৫ জুলাই বাংলার সবুজ মাটির মায়া ত্যাগ করে মহান স্রষ্টার কাছে নিজেকে চিরদিনের জন্য সমর্পন করলেন তিনি।

www.amarboi.org

শিশু-সাহিত্যিক নাসির আলী

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের একটি গ্রাম দাহদা, লোকমুখে উচ্চারণ দাঁড়ায় ধাইদার। এই ধাইদা গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্তা ছিলেন মোহাম্মদ ইজ্জত আলী। তাঁর এক পুত্র হায়দার আলী ব্যবসা উপলক্ষে গোয়ালন্দের রাজবাড়ি শহরে বাস করতেন। সেখানে তাঁর এক পুত্র হায়দার আলী ব্যবসা উপলক্ষে গোয়ালন্দের রাজবাড়ি শহরে বাস করতেন। সেখানে তাঁর একটি জুতার দোকান ছিল।

হায়দার আলীর স্ত্রীর নাম কসিমুন্নেসা। তাঁদের দুই কন্যা সহ মোট এগারটি সন্তান ছিল। কিন্তু পুত্র সন্তানদের দু'জন ছাড়া বাকিরা অকালে মৃত্যুবরণ করে। ১৯১০ সালের ১০ জানুয়ারি জন্ম হয় তাদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান। পুত্রের দিক থেকে তিনিই তৃতীয়। বাবা-মা নাম রাখলেন মোহাম্মদ নাসির আলী। জন্মের সময় তাঁর গায়ের রং খুব ফর্সা ছিল। এজন্যে তাঁর ডাকনাম রাখা হলো কফুর অর্থাৎ কর্পূর। জন্ম ধাইদার হলেও নাসির আলীর শৈশবকাল কেটেছে বাবার বাসস্থান রাজবাড়ি শহরে। তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরুও সেখানেই। তবে, কিছুদিন পর তিনি গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন এবং সেখানে থেকেই পড়াশোনা করতে থাকেন।

www.amarboi.org

হায়দার আলী দোকানের সামান্য আয়েই পরিবারের সকল ব্যয় নির্বাহ করতেন। পরিবারের এক অংশ ধাইদায় এবং একাংশ রাজবাড়িতে রাখতে হতো। এক সঙ্গে দুই জায়গায় সংসার চালানো কঠিন। কিন্তু হিসেবী হায়দার আলী তাতেও অসুবিধায় পড়েননি। যার ফলে বাবার চরিত্রের মিতব্যয়িতা পরবর্তীতে নাসির আলীর চরিত্রেও পড়েছিল। কারণ বাবা লেখাপড়া জানতেন না ঠিকই, কিন্তু শিক্ষার মূল্য তিনি ভালভাবেই বুঝতেন। তাই তাঁর সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

সেই ছেলেবেলা থেকেই নাসির আলী ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী। চারদিকের প্রতিটি ছন্দপতনই তাঁর অনুভূতিকে ছুঁয়ে যেতো। দখিন পাড়ার গরীব কৃষক ইয়ার আলীর ছেলেটি যখন উদোম গায়ে মাঠে যেতো, হরিহরের রুগ্ন ছেলেটি যখন মাটি কেটে ক্লান্ত হতো- কিশোর নাসির আলী তখন কেমন যেন উদাস হয়ে যেতেন। ওরা কেনো তাঁর মত বই হাতে নিয়ে পাঠশালায় যায় না, সে প্রশ্নের জবাব খুঁজে খুঁজে ব্যাকুল হতেন তিনি। পদ্মা নদীর ঢেউয়ের বুকে যখন লাল-নীল পাল তুলে অজানা বন্দরের মাঝিরা নৌকা ভাসাতো, বালক নাসির আলীর মন তখন পাখির মতো চঞ্চল হয়ে উঠতো। ইচ্ছে করতো সপ্তডিঙ্গা ভাসিয়ে দিয়ে অচিন দেশে হারিয়ে যেতে।

তাঁর হাতেখড়ি হয় যথাসময়ে' যখন তিনি রাজবাড়িতে বাবার কাছে থাকতেন তখন। কিন্তু নিয়মিত পড়াশোনার সূচনা এর কিছু পরে। তখন তিনি একটু বড় হয়েছেন। বাবা তাঁকে গ্রামে এনে "কালিমোহন দুর্গামোহন ইনস্টিটিউশন" নামে একটি হাই স্কুলে ভর্তি করে দেন। স্কুলটি ছিলো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়িতে, তেলিরবাগ গ্রামে। এই স্কুল থেকেই তিনি ১৯২৬ সালে প্রথম বিভাগে এস.এস.সি. পাশ করেন। তাঁর পরীক্ষার ফল দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দেন।

তারপর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকায় চলে আসেন। ১৯২৮ সালে তিনি জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন। তারপর ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে বি.কম. ডিগ্রি নিয়ে বেরোন ১৯৩১ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি দু'বছর মাসিক পাঁচ টাকা হারে বৃত্তি ভোগ করেন।

মোহাম্মদ নাসির আলীর সংসারজীবন শুরু হয় ১৩৮০ সালের আশ্বিন মাসে। বাবা স্থির করেছিলেন একটি গ্র্যাজুয়েট মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবেন। এ বিয়েতে ছেলের মতামতের কোন প্রশ্ন উঠেনি।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে নাসির আলী জীবিকার সন্ধানে কলকাতা চলে যান। সেখানে তিনি ওঠেন কলিন্স স্ট্রীটের একটি মেসে। এই মেসে বিক্রমপুরের

www.amarboi.org

নওয়াপাড়া গ্রামের এক ভদ্রলোক থাকতেন। তার নাম আবদুল খালেক চৌধুরী। এক সময় আবদুল খালেক চৌধুরীর সাথে নাসির আলীর অনেক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে চৌধুরী সাহেবের এক মেয়ে মেহেরুন্নেসার সাথে নাসির আলীর বিয়ে ঠিক হয়। মেয়েটি ছিলো রোগা। এই খবর পেয়ে বাবা হায়দার আলী খুব রাগ করেন। বাবাকে এই বিয়েতে মোটেও রাজি করতে পারলেন না। যেদিন নাসির আলীর বিয়ের গায়ে হলুদ হয়, সেইদিনই হঠাৎ হায়দার আলী মারা যান। লোকের ভয় ছিলো এই বিয়ের ফল ভালো হবে না। কিন্তু লোকের ভয় যা-ই থাকুক নাসির আলী সুখেই জীবন কাটান।

কলকাতা এসে নাসির আলী ৪০ টাকা বেতনে একটি টিউশনি করেন। দুই বছর পর তিনি একটি চাকুরী পান। তা ছিল অনুবাদকের। পরবর্তীতে হাইকোর্টে আর একটি চাকুরী নিয়ে চলে আসেন। তাও অনুবাদকের। ভারত বিভাগের পর তিনি বদলি হয়ে ঢাকা হাইকোর্টে চলে আসেন। সরকারী চাকুরী জীবনের শেষ পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১৯৬৭ সালে। এর মধ্যে তিনি অনেক দৈনিক পত্রিকাতেও কাজ করেন।

ধীর-স্থির এবং সদা কর্মব্যস্ত এই মানুষটি সকল দিকেই দৃষ্টি রাখতেন। সংসারের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ থেকে শুরু করে চরিত্র গঠন ইত্যাদি সব বিষয়েই তিনি ছিলেন সচেতন। পরিবারের কর্তা এবং স্নেহশীল পিতা হিসেবে তিনি পুত্র-কন্যা সবাইকে এমনভাবে গড়ে তোলেন, যাতে তারা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ছোটবেলা থেকেই নাসির আলী ছিলেন সাহিত্যের একজন ভক্ত পাঠক। তাঁর সাহিত্য পাঠের অভ্যাস গড়ে ওঠে ছাত্র জীবনের সূচনা থেকেই।

তিনি যখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় স্কুলের কোন এক ছেলের হাতে এক কপি "সন্দেশ" দেখতে পান। পত্রিকাখানি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন কেড়ে নেয়। কিন্তু বড় বড় ছাত্রদের ভিড়ে পত্রিকাটি পড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি একদিন সন্দেশের মালিক ছেলেটির বাড়ি গিয়ে পত্রিকাটি দেখে আসেন। আর, সেই দেখা তাঁর মনে জন্ম দেয় এক নতুন আগ্রহ। এরপর তিনি এই পত্রিকার গ্রাহক হয়ে যান। পরবর্তীকালে কৈশোরে তিনি আরো কিছু পত্রিকার গ্রাহক হন। সেগুলোর মধ্যে ছিলো সেকালের কলকাতার অতি উন্নতমানের সাপ্তাহিক "নবযুগ"।

তিনি স্কুলজীবনের গোড়ার দিকেই সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। প্রথম জীবনে তিনি গদ্য চর্চার সাথে সাথে কবিতা চর্চাও শুরু করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনাটি ছিলো বড়দের জন্য লেখা, নাম "পটলা"। একটি কিশোরকে নিয়ে লেখা গল্পটি প্রকাশিত হয় "নবযুগ" পত্রিকায়। তিনি তাঁর প্রথম লেখাটি লিখেছেন শ্রীমতি

www.amarboi.org

নীহার বালা দেবী নামে (ছদ্মনামে)। আগের দিন পত্র-পত্রিকা ছিলো খুব কম। যা দু'একটি ছিলো তাও চালাতো হিন্দুরা। লিখতোও বেশিরভাগ তারাই। মুসলমানের লেখা পেলে হিন্দু সম্পাদকরা তা ফেলে দিতো। যার ফলে তিনি ছদ্মনামে লেখা পাঠালেন। লেখা পাঠানোর দু-তিন সপ্তাহ পর নবযুগে দেড় পৃষ্ঠা জুড়ে ছাপা হলো তাঁর গল্পটি। এর আগে নাসির আলী নামে পাঠানো তাঁর অনেক গল্পই এই পত্রিকায় ছাপেনি। এভাবে সাহিত্যের প্রকাশ্য আসরে প্রবেশ করেন নাসির আলী। তখন থেকেই তার বিভিন্ন আঙ্গিকের রচনা কলকাতার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। স্বনামে নাসির আলীর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে।

নাসির আলীর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা একচল্লিশ। এগুলোর মধ্যে একখানি ছাড়া সবই শিশুতোষ। বাংলাদেশে একমাত্র বন্দে আলী মিয়া ছাড়া তোমাদের মত শিশু কিশোরদের জন্য লেখা আর কোন লেখকের এতগুলো শিশু-কিশোর উপযোগী বই প্রকাশিত হয়নি।

মোহাম্মদ নাসির আলী ছিলেন জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মিতাচারী। পোশাক পরতেন অতি সাধারণ। গরমকালে পায়জামা-পাঞ্জাবী, শীতকালে এসবের উপর একটি শেরোয়ানি পরতেন। খাওয়ার টেবিলে বসলে তিনি আমাদের দেশীয় রুচির সাধারণ খাবার খেতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, অমায়িক এবং সদালাপী। তাঁর মহৎ চিন্তা ও কাজের অপূর্ব সামঞ্জস্য ছিলো, যার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। কী শিশু সাহিত্যে, কী শিল্পে, কি ব্যক্তিগত আচরণে তিনি সততার যে আদর্শ রেখে গেছেন, তা চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে।

১৯৭৪ সাল থেকে তিনি বুকের ব্যথায় ভুগছিলেন। এই সময়টা তিনি বড় একটা বাইরে যাননি। শেষের দিকে ব্যথা আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। সেদিন তিনি নিজের হাতে বালিশ উঠিয়ে উত্তর দিকে রাখেন। এই দেখে তার স্ত্রী বলেন, আপনি এমন করছেন কেন? নাসির আলীর রসপ্রিয়তা তখনও যায়নি। তিনি জবাব দেন, যাঁরা মহাপুরুষ, তাঁরা তো মরবার সময় উত্তর দিকেই মাথা রাখেন। ওই দিনই অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ৩০শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪টায় তিনি এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যান-পরজগতে।

www.amarboi.org

কবি আব্দুস সাত্তার

তোমরা তো অনেক কবির নামই শুনেছো কিন্তু অরণ্য জনপদের কবি কে ছিলেন বলতে পারো? হ্যাঁ, আমি জানি তোমরা বলবে কবি আব্দুস সাত্তার ছিলেন অরণ্য জপদের কবি। কারণ আব্দুস সাত্তারকে চিনবে না এমন বন্ধু তো কমই আছে। আর চিনবেই না কেন, তিনি তো তোমাদের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। তোমাদের মতো ছোট্ট বন্ধুদের জন্য তো তিনি কম লিখেননি। ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ কতোই না লিখেছেন তিনি। আর তার লেখা গল্প-কবিতাও তো কম আনন্দ দেয়নি। তাঁর লেখায় যেমন পরীর দেশে নিয়ে যেতেন তেমনি নিয়ে যেতেন বাংলাদেশের পাহাড় পর্বত বনজঙ্গলে। পড়তে পড়তে নিজেকে যেমন রাজপুত্রের মতো মনে হতো, তেমনি আবার একজন পরিব্রাজক সাজতেও মন্দ লাগতো না। তোমাদের জন্যে তাঁর অনেক লেখা। প্রায় সব মিলিয়ে ১১৭টি বই লিখেছেন তিনি। এসব বইয়ের মধ্যে আছে ভিন্ন ধরনের স্বাদ। একবার পাতা উল্টালে শেষ না করে ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

কবি আব্দুস সাত্তার ছিলেন সবার প্রিয় মুখ। তিনি যেমন ছোট-বড় সবাইকে

www.amarboi.org

ভালোবাসতেন তেমনি তাঁকেও সবাই ভালোবাসতেন। ভালোবাসবেনই না কেন, সেই পঞ্চাশের দশক থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এমন কোনো লিখিয়ে বন্ধু নেই যার সাথে কবি আব্দুস সাত্তারের পরিচয় নেই। কি খ্যাতিম্যান, কি নবীন এমন কোনো লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি জীবনে দু'একবার কবি আব্দুস সাত্তারের সাথে গল্পের আসরে কোনো না কোনো টেবিলে শরীক হননি। এ কবির প্রকাশনা জগত এতো বিস্তৃত যে, সকল ঘরে 'সবার দুয়ারে তার বিচরণ' তিনি রসিয়ে রসিয়ে কথা বলতেন। কি ছোট কি বড় সবাইকে আদর করে কপালে চুমো খেতেন। এমন উদার প্রেমিক কবি খুব কমই চোখে পড়ে। তাঁর মুখে সবসময় হাসি ফুটে থাকতো।

এবার চলো না কবির ব্যক্তিজীবন থেকে কিছু প্রয়োজনীয় কথা জেনে নিই। ১৯২৭ সালের ২০ জানুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার গোলরা গ্রামে কবি আব্দুস সাত্তার জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৌলভী আবদুস ছোবহান বদু।। আর মাতার নাম সাবিউন নেসা।

কবিতা দিয়েই তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু। ১৯৪৩ সালে কবি আব্দুস সাত্তারের প্রথম ছড়া ছাপা হয় দৈনিক আজাদ পত্রিকার মুকুলের মাহফিলে। প্রথম কবিতা ছাপা হয় কখন জানো? ১৯৪৫ সালে মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়। তখন তিনি মাত্র মেট্রিক ক্লাসের ছাত্র। তারপর থেকে আর লেখায় বিরাম পড়েনি। ১৯৫১ সালে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। এক পর্যায়ে তিনি চাকরির কারণে বন-জঙ্গলের অর্থাৎ অরণ্য জনপদের অধিবাসী হয়ে পড়েন। ঢাকার বাইরে যেতেন, ঘুরতেন নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন। আর এসব কথা নিজের ভাষায় এতো সুন্দর করে প্রকাশ করতেন যা একবার না পড়ে ছাড়তে ইচ্ছে করতো না। তখন ঢাকায় কবি ৩৩-এ/ নীলক্ষেত ব্যারাকে থাকতেন। ঢাকায় এলে তার 'বৃষ্টিমুখর' কবিতার বই প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ সালে কবি রাঙ্গামাটি চলে যান। এখানে এসে চাকমাদের দেখে তিনি অভিভূত হন। চাকমাদের বৈচিত্র্যময় জীবনধারাই তাঁকে প্রধানত আদিবাসীদের সম্পর্কে লিখতে উৎসাহিত করে। ১৯৬৫ সালে 'অরণ্য জনপদ' নামে তাঁর একটি বই জনৈক কাবলির সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়। জলি বুক্স প্রকাশনা নাম দিয়ে ৩নং রোকনপুর থার্ড লেন ঠিকানা থেকে অরণ্য জনপদ বের হয়। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে, একসময় এই বইয়ের জন্যে তিনি 'দাউদ' সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। এই পুরস্কার ঘোষণা করে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র। তখন 'পাসবান ও জঙ্গে' নামে দু'টি দৈনিক উর্দু পত্রিকাসহ অন্যান্য পত্রিকায় ছবিসহ কবির সাহিত্য পুরস্কারের খবর ছাপা হয়। এরপর থেকে তাঁর নতুন নতুন বই

www.amarboi.org

প্রকাশ হতে থাকে। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নাম।

কবি আব্দুস সাত্তারের প্রকাশিত বইগুলোর সামান্য কয়টির নাম তোমাদের জন্য তুলে দিচ্ছি-বৃষ্টিমুখর, অন্তরঙ্গ ধ্বনি, আমার ঘর নিজের বাড়ী, আমার বসবাস, বিম্বিত স্বরূপ, নাত যুগে যুগে, আরবী কবিতা, আরণ্য জনপদে, আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য, আরণ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভিন্নতর সুরভী, আরো উল্লেখযোগ্য কতো বই লিখেছেন তিনি।

সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কবি বেশ কয়েকটি পদক পুরস্কার ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। যেমন ধরো, দাউদ সাহিত্য পুরস্কার, আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার, লেখিকা সংঘ সাহিত্য পুরস্কার, আশরাফ ফাউন্ডেশন সাহিত্য পুরস্কার, টাঙ্গাইল জেলা সমিতি সাহিত্য পুরস্কার, আলবার্ট আইন স্টাইন একাডেমী পদক, ঢাকা পৌরসভা পদক, টাঙ্গাইল জেলাবাসী কর্তৃক পদক প্রভৃতি।

কবি আব্দুস সাত্তার অনেকগুলো ভাষা জানতেন। ফলে বিভিন্ন দেশের ভাষায় লিখিত সাহিত্য কর্মগুলো তিনি সুন্দরভাবে বাংলায় অনুবাদ করে পাঠকের হাতে তুলে দিতেন। তাছাড়াও তিনি অনেক বড় বড় কাজ করছেন।

এই মানুষটি আজ আর আমাদের মাঝে নেই। ২০০৩ সালের ১লা মার্চ তিনি এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। অথচ আমরা এতো দুর্ভাগ্য জাতি কেউ তার কথা, তার নাম মনে রাখিনি। যার লেখায় আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি উদ্দীপ্ত হতো এমন ভালো মানুষটি যেমনিভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তেমনিভাবে সবার মন থেকেও যেন বিদায় নিয়ে গেছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। তা নাহলে যে মানুষটি আমাদের গোটা জাতিকে এতো কিছু দিয়ে যেতে পারলেন অথচ আমরা তাঁকে কিছুই দিতে পারলাম না। না পারলাম তার মৃত্যু দিবসে তার আত্মার প্রতি মাগফিরাত কামনা করতে। এথেকে আর বেদনার কি হতে পারে। যে জাতি তার ইতিহাস ভুলে যায় সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। বড় হতে হলে ইতিহাসকে সংরক্ষণ করতে হবে। শিক্ষা নিতে হবে। তাহলেই উন্নত জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে।

www.amarboi.org

আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন

তোমারা কথা সাহিত্যিক ও কবি আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিনকে নিশ্চয়ই চিনো। আর না চিনারতো কথা নয়। কারণ তিনি তোমাদের মত ছোট্ট বন্ধুদের জন্য পত্রিকার পাতায় পাতায় কত লেখাই না লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে শিশুতোষ সাহিত্যের বাঁকে বাঁকে ছিলো তাঁর বিচরণ। সেই মানুষটির কথাই তোমাদেরকে বলছিলাম।

আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন ১৯৩৪ সালের ২০ এপ্রিল কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার ফেনুয়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল আউয়াল, আর মাতার নাম হাফসা বেগম।

গ্রামের পাঠশালা থেকেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। একে একে তিনি সব পাঠ শেষ করে ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এ পাস করেন। কর্মজীবনে মুসলেহ উদ্দিন বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের বড় কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি একাধারে ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, জীবনী, ধর্মীয় কাহিনী লিখে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন করেছেন।

আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন কর্মজীবনে পুলিশের কর্মকর্তা হলেও তিনি

www.amarboi.org

ছিলেন হাস্যরসিক। তাঁর ছিলো গাল্পিক মন। তদুপরি বিখ্যাত কবিও। শিশু মনের অধিকারী এই কবি ছোট ছোট শিশুদের হাসির জগতে আকর্ষণ করেছেন। কখনো নির্মূল আনন্দ বিরতণ করেছেন, কখনো বা নীতি, উপদেশপূর্ণ ভাল ভাল কথা গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরে তৃপ্ত করেছেন।

নীতি-উপদেশ, আনন্দ, হাস্য, কৌতুক, রোমাঞ্চ ইত্যাদি আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিনের সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায়। গল্প, কবিতা-গদ্য-পদ্য উভয় রচনাতেই আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন সমান পারদর্শি।

অসাধারণ সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি ও কথা সাহিত্যিক। তাঁর কবিতায় আছে, ছন্দ, শিল্প সুষমা, ভাবের সুঠাম বিন্যাস আর নিখুঁত কারুকাজ। তাঁর রচিত প্রতিটি লেখায় ধ্বনিত একটি ম্যাসেজ যা বড় মাপের একজন কবির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গল্প, উপন্যাস, নাটিকার মাধ্যমে তিনি ছোটদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। চলতি ভাষার ঝংকারে রস-রচনা লিখেছেন তিনি অনেক। মন ও মেজাজে চঞ্চল এই লেখক সমাজ বা জাতির জন্য মূলত লেখনী ধারণ করলেও তার শিশুতোষ রচনাবলী স্পন্দিত হয়েছে। শিশু-সাহিত্যে তিনি ছিলেন আলোর অভিসারী, রঙিন সকাল প্রত্যাশী মানবাতবাদী।

আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন তরুণদেরকে খুব স্নেহ করতেন। টেলিফোন করে বাসায় ডেকে নিতেন। গল্প করতেন। নিজ হাতে চা-বানিয়ে খাওয়াতেন। নামাজের সময় হলে নিজের ইমামতিতে জামায়াতে নামাজ আদায় করতেন।

আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন পুলিশের লোক হলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত নরম দিলের মানুষ। তবে কোন অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না। সাথে সাথে তাঁর প্রতিবাদ করতেন। নিজে কোন বিপদে পড়লে গভীর রাতে মসজিদে চলে যেতেন। সারা রাত মসজিদে কাটাতেন, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন। তাঁর মুখে শুনা একটি ছোট্ট গল্প বলছি তোমাদের। ১৯৭৪ সালে ১৪ আগষ্ট। তখন মুসলেহ উদ্দিন খুলনায় পুলিশের বড় কর্মকর্তা। খুলনা অঞ্চলে সরকারী দলের নেতা-কর্মীরা এত ব্যাপক সন্ত্রাস শুরু করে দিয়েছিলো যে, মানুষ এতে বিরক্ত হয়ে পড়ে। ফলে মুসলেহ উদ্দিন পুলিশকে হুকুম করলেন, সব সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করার জন্য। গ্রেফতার করে জেলখানা ভর্তি করা হলো ঠিকই, কিন্তু সরকারকে খুশি করতে পারলেন না। যেহেতু সব সরকারী দলের কর্মী। একারণে সরকারের পক্ষ থেকে সবাইকে ছেড়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি নির্দেশ পাওয়ার পর রাতের বেলায় খানজাহান আলীর মসজিদে চলে গেলেন। সারারাত মসজিদে কাটালেন।

www.amarboi.org

আল্লার কাছে সাহায্য চাইলেন। এই ছিলো আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন।

গ্রামের মানুষদের অত্যন্ত ভালবাসতেন তিনি। তাঁর বাড়ীতে প্রায় গ্রাম তেকে গরীব মানুষরা আসতেন। তিনি তাদেরকে সাহায্য করতেন। তাঁর বাড়ীতে অনেকে থাকতেন। ওদের সাথে মিষ্টি সুরে কথা বলতেন।

তাঁর গজনবী রোডের বাড়ীর ছাদে তিনি বাগান করতেন। সেখানে অনেক ফলের গাছও ছিলো। ভক্তদের বলতেন, আমি ছাদে। আসুন। আমার বাগানের গাছের পেয়ারা খাওয়াবো। তারপর এক সাথে নামাজ পড়বো। গল্প করবো।

কথা সাহিত্যিক কবি মুসলেহ উদ্দিন তোমাদের মতো ছোট্ট বন্ধুদের জন্য অনেক লিখেছেন। এর মাঝে কয়েকটি বই-এর নাম উল্লেখ করলাম। যেমন ধরো- হরেক রকম, রাজপুত্তুর, তাকডুমাডুম, গুটুল মুটুল, লাল টুকটুক, কুরমুর ভাজা, তাধিন ধিনতা, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি, চিং পাহাড়ের হাতী, অপারেশন স্বর্ণ মূর্তি উদ্ধার। অবশেষে তাঁর অসুস্থ হওয়ার মাঝে প্রকাশিত হয় পিটপিট পিটম্যান।

আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন যে সব পুরস্কার পান-সুহৃদ সাহিত্য পুরস্কার, আবুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার, শেরে বাংলা সাহিত্য পুরস্কার, কাল চক্র সাহিত্য পুরস্কার, অগ্রণী সাহিত্য পুরস্কার।

এই বড় মানুষটি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। ২০০২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন পরজগতে। কিন্তু আমাদের জন্য রেখ্যো গেছেন অমুল্য সম্পদ তার সাহিত্য ভান্ডার। আমরা যদি আজ তাঁর রেখা যাওয়া এসব সাহিত্য নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করি তা হলে তাঁর এই সাহিত্য কর্ম সার্থক হবে। চলো না আল্লাহর কাছে সবাই দোয়া করি। আল্লাহ যেন তাঁর জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেন।

www.amarboi.org

আতোয়ার রহমান

বাংলাদেশের সাহিত্যের যে কটি শাখা সবচেয়ে পুষ্ট এবং জনপ্রিয়, শিশু সাহিত্য সেগুলোরই একটি। জন্মলগ্নে-এর অবস্থা কেমন ছিল জানো? একেবারেই করুণ। যেমন ধরো, গুণের বিচার, তেমনি পরিমাণের দিক থেকে। ভারত বিভাগের পর উদ্ভত সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক সংকট এই সাহিত্যের জন্ম এবং বিকাশ নানাভাবে বিঘ্নিত করে। কিন্তু ক্রমে নতুন সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষের মাধ্যমে এবং কয়েকজন সাহিত্যকর্মীর অদম্য উৎসাহ আর সৃষ্টি প্রয়াসে অল্পকালের মধ্যেই এ সংকটের নিরসন শুরু হয়। এবং সেই সাথে ঘটতে থাকে গুণে-পরিমাণে তার পুষ্টিলাভ আর অগ্রগতি।

উক্ত সংকটকালে তোমাদের মতো ছোট্ট বন্ধুদের কথা ভেবে, যে মানুষটি এগিয়ে এসে শিশু-সাহিত্যের দ্বার উন্মোচন করেন তিনি হলেন যুগের অন্যতম প্রধান শিশু সাহিত্য কর্মী আতোয়ার রহমান। তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা শিশু সাহিত্যের কথা ভাবতে পারি না। তাঁর নাম আমাদের সকল শিশু-কিশোরের অন্তরেও শিশু-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কোথায় জন্ম হয়েছে এই মানুষটির জানো? ১৯২৭ সালে ১৫ মার্চ আতোয়ার রহমান কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারায়

www.amarboi.org

জন্মগ্রহণ করেন।

তোমরা যারা কচি শিশু-কিশোর তাদের কথা তিনি সব সময় ভাবতেন। তিনি তোমাদের মতো ছোট্ট বন্ধুদের আনন্দ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীতিবোধও শিক্ষা দিতেন। ছোটরা তার বই পড়ে যেমন মজা পেতো, তেমনি জীবন গড়ার ভালো পরামর্শও এর ভেতর খুঁজে পেতো।

এই প্রিয় মানুষটি সম্পর্কে এত অল্প সময়ে জানা সম্ভব নয়। তাঁকে জানতে হলে তোমাদেরকে তার লেখার কাছে গিয়ে পৌঁছতে হবে। তা হলে বুঝতে পারবে তিনি তোমাদের মতো শিশু-কিশোরদেরকে কতো ভালোবাসতেন। যেমনিভাবে ছোটদের আপন করে নিয়েছিলেন তিনি তেমনিভাবে নিজের জীবনটাকেও সাহিত্যের সাথে একাকার করে নিয়েছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে এ মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, অমায়িক এবং সদালাপী। তার মধ্যে মহৎ চিন্তা ও কাজের যে অপূর্ব সামঞ্জস্য ছিল, তার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। কি শিশু সাহিত্য, কি শিল্পে, কি ব্যক্তিগত আচরণে তিনি যে আদর্শ রেখে গেছেন, তা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শিশুসাহিত্য সম্পর্কে আমাদের বেশীর ভাগ সংস্কৃতিসেবীর মনে যে ভ্রান্ত ধারণা কাজ করে আতোয়ার রহমান ছিলেন তার ঊর্ধ্বে। তিনি তাঁকে পরিণত মেধার কর্ম হিসেবেই বেছে নিয়েছিলেন। এ কারণেই শিশুবিষয়ক তাঁর মেধাবী রচনা আমাদের জন্য বড় সম্পদ। তার রচনায় আমরা খুঁজে পাই শিশুসাহিত্যের আসল রস। তিনি শিশুদের জন্য লেখা তার রচনার মান কখনোই শিশুসুলভ হতে দেননি।

আমাদের সমাজে যে বয়সে সবাই গুটিয়ে যায় সেই বয়সেও তাঁকে দেখেছি তৎপর। তোমরা যারা শিশু-কিশোর তাদের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ ছিল বলেই হয়তো আজীবন নিজের মধ্যে এই সঞ্জীবতা অক্ষুণ্ন ছিল। লেখকদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগানোর ক্ষেত্রেও তার মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে। আত্মমর্যাদার দিক থেকে আতোয়ার রহমান ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি কখনো কারো সাথে এমন আচরণ করেননি যার জন্য কেউ তাঁকে ছোট ভাবতে পারে। আতোয়ার রহমান মূলত একজন লেখক। শিশুসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত এবং প্রতিষ্ঠিত।

আতোয়ার রহমান কতোগুলো ভাষা জানতেন জানো? তিনি জার্মান, ফরাসী, রুশ, স্প্যানিশ, হিব্রু, আরবী, ফার্সী, উর্দু, নেপালী ও হিন্দীসহ ১৭টি ভাষা জানতেন। তার লেখা বইয়ের সংখ্যাও কম নয়। ৭০টিরও বেশী গ্রন্থের রচয়িতা তিনি।

আতোয়ার রহমান বাংলা একাডেমীর ফেলো ছিলেন। তাছাড়া ১৯৭০ সালে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। ২০০২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ছোট-বড় সবার প্রিয় এ মানুষটি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন পরপারে।

www.amarboi.org

সবার বন্ধু নূরী ভাই

এক ফেরিওয়ালা মাটির রকমারি হাঁড়ি-কুড়ির পসরা নিয়ে এসেছে বাড়িতে। তার চড়া গলার হাঁক শোনার পরই একটি ছেলে ছুটে যায় সবার অলক্ষ্যে। আর অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে ফেরিওয়ালাকে ঃ ও বেতা, পাতিল কুতু? অর্থাৎ হে পাতিলওয়ালা, তোমার পাতিলের দাম কত? ফেরিওয়ালার নজর পড়লো ছেলেটির দিকে। আদর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার নাম কি গো।" আমাল নাম নূলী। জবাব দেয় ছেলেটি। পাতিল নেব? তোমাল পাতিল কুতু, বল না। ছোট্ট একটি শিশুর কণ্ঠে কতো'র জায়গায় কুতু শব্দটি নিয়ে মা ও বাড়ির সবাই কতইনা হাসাহাসি করেছে। দাদি তো প্রায়ই খেপাতেন-এই নূলী, তোমাল পাতিল কুতু। আর অমনি ছেলেটি হাসতো।

বয়স মাত্র আড়াই বছর। দেখতে ফুটফুটে। শরীর স্বাস্থ্য ভালো। ফলে হাঁটতে শেখার কসরতটা আট-নয় মাস বয়সেই শুরু হয়ে যায়। মায়ের কোল থেকে কিছুক্ষণের জন্য ছাড়া পেলেই হেলে দুলে উঠানে হাসের শাবক কিংবা মোরগ ছানার পেছনে ধাওয়া করতো। পরনে নেংটি কিংবা হাফ পায়জামা। কপালের

www.amarboi.org

ডানপাশে ঈর্ষকদের বদনজরকে ঘায়েল করবার জন্য সযত্নে আঁকা একটি তিলক। হাতে তার দেড়-দু'হাত লম্বা বাঁশের কঞ্চি। বড়দের মতো চোখ রাঙ্গিয়ে এই এই শব্দ করে তাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে ধান খেকো হাস-মোরগগুলোকে। তার কাণ্ড দেখে ঠোঁট টেনে হাসতেন মা।

জ্যৈষ্ঠের দুপুর। চারদিকে খাঁ খাঁ করছে রোদ। পূর্ব দিককার উঠানে শুকাতে দেয়া হয়েছে সেদ্ধ ধান। মা ব্যস্ত রান্নাবান্নায়। কাজের মেয়েরা ঢেকিশালে। ব্যস্ততার জন্য কারোই খেয়াল ছিলো না তার দিকে। হঠাৎ একঝাঁক কাঁকের চেঁচামেচি আর ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনে উৎকর্ণ হলেন বড় মা। হঠাৎ মনে পড়লো নূরীর কথা। বড় মা ডাকছেন, নূরী, ও নূরী। কই গেলো ছেলেটা, আধ ঘন্টা আগেই তো দেখেছি আমিনার সাথে খেলতে। বিড় বিড় করে বলছেন আর খুঁজছেন। উঠান ফাঁকা তারা দু'জন কেউ নেই।

পুকুরপাড়ে অনেকগুলো আমগাছ। কাঁচা মিঠা, সিঁদুরে আর দুধাল গাছ ছাড়া ছিলো একটি কিংবদন্তিখ্যাত আম্রতরু। এটিকে বলা হতো সিদ্দিকার মায়ের আমগাছ। বড় মায়ের আচমকা খেয়াল হলো, আমগাছের উপর কাকদের চেঁচামেচির দিকে। কাকেরা নির্ঘাৎ বয়ে বেড়াচ্ছে কোন দুঃসংবাদ। এটা মনে হতেই বড়মা ছুটলেন পুকুর পাড়ের দিকে। ঘাটের সিঁড়িতে পা রাখতেই দেখলেন মাঝপুকুরের অথৈ পানিতে কাতল মাছের মতো চিৎ হয়ে ভাসছে নূরী। আর আমিনা ঘাটের ওপর বাঁ-হাত ভর রেখে ডানহাত তার দিকে মেলে ধরে রেখেছে। আমিনা ডুকরে কাঁদছিলো। কিন্তু কাকের হল্লার জন্য বাড়ির কারো কানে যায়নি তার কান্নার শব্দ।

জ্যৈষ্ঠের শেষদিকে পানিতে টইটম্বুর হয়ে যায় এই পুকুরটি। ঘাট থেকে হাত তিরিশেক দূরে যেখানে ছিলো রক্তশাপলার বন, চিৎ হয়ে ভাসতে ভাসতে তার কাছাকাছি গিয়েছে নূরী। সঙ্গে সঙ্গে বড়ো মা ঝাঁপ দিলেন পুকুরে। অঢেল পানি। নূরীকে দু'হাতে উঁচু করে ধরে তিনি মাছের মতো সাঁতরাচ্ছেন। কখনো ডুবছেন, কখনো ভাসছেন। স্বাস্থ্যবান বাড়ন্ত ছেলেটিকে ভরের ওপর রাখতে গিয়ে প্রায় প্রতিমুহূর্তে থৈ-না পাওয়া পানির সাথে লড়তে হচ্ছে তাঁকে। ঘন ঘন বদল করতে হচ্ছে শ্বাস। নাক দিয়ে মুখ দিয়ে খেতে হচ্ছে পানি। শেষে ছেলের প্রাণের সাথে কোনো মতে নিজের প্রাণটাকেও রক্ষা করে ধরতে পেলেন কূলের নাগাল। আসলে সেটি ছিলো তার দ্বিতীয় জন্ম। আর বড় মা'ই এই নতুন জন্মটির স্বাদ দিয়েছিলেন তাঁকে। তা না হলে আড়াই বছরের একটি শিশু কেমন করে মুখ ওপরের দিকে রেখে এতোটা সময় পানিতে ভেসে থাকতে পারে তা গ্রামের লোকদের কাছে একটা আশ্চর্য ঘটনা। সবাই বলতো, এটা অলৌকিক কাণ্ড। আল্লাহর কুদরতী হাতের

www.amarboi.org

ইশারা।

তাহলে কে এই নূরী? নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো। যাদের সাথে তাঁর হৃদয়ের সম্পর্ক তাঁর কথা কে না বুঝতে পারে। কে না জানে তাঁর জীবনের মজার মজার কথাগুলো। তিনি হলেন ছোট-বড় সবার প্রিয় বন্ধু, আমাদের নূরী ভাই। আমরা যাকে সানাউল্লাহ নূরী ভাই বলে ডাকতাম। নূরী ভাই এ কথাটি তোমাদের কারো অজানা নয়, তিনি আমাদের দেশেরই একজন মনীষী ছিলেন। গ্রামবাংলার আলো-ছায়ায় তাঁর শৈশব-কৈশর কেটেছে। সৎ ও মহৎ সবার বন্ধু, সততা ও মহত্বের বড় সুন্দর ও বিনয়ী এই মানুষটিই তো হলেন আমাদের নূরী ভাই। ১৯২৮ সালের ২৮শে মে নোয়াখালী জেলার এক পল্লীগ্রামে জন্ম হয় নূরী ভাইয়ের। তাঁর পিতার নাম মাওলানা মোহাম্মদ সালামতউল্লাহ। তিনি আজীবন দেশের কথা ভেবেছেন। আর মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন। দেশের মানুষগুলোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। শিশুদের গড়ে তোলার কাজে এক নিবেদিত প্রাণর কর্মী। কত শ্রমই না দিয়েছিলেন ছোটদের জন্য। দেশের একপ্রান্তর থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়াতেন। খোঁজ নিতেন লাখ লাখ শিশু-কিশোরের। জিজ্ঞেস করতেন, তোমরা কেমন আছ বন্ধুরা।

নূরী ভাই তোমাদের জন্য লিখেছেন অনেক বই। তোমাদের জন্য তিনি অনেক ভালো ভালো কথা বলেছেন। অনেক আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তোমরা যারা শিশু-কিশোর তারা নূরী ভাইয়ের জীবনের কর্মপ্রবাহের মধ্যে খুঁজে পাবে নিষ্ঠা, সততা ও দেশপ্রেম।

নূরী ভাই নিজেই বলেছেন; "আজ ভবিষ্যতের পানে তাকালে মনে হয়ঃ সত্যি কি নিরাপদ কোনো কূলে ফিরতে পেরেছি? সে যাত্রা শুধু প্রাণটি নিয়ে বাঁচলেও ফাঁড়ার অক্টোপাস থেকে তো আজো রেহাই পেলাম না। মায়ের মুখে শোনা শৈশবের গল্পগুলোর কথা ভাবলে আজো স্বর্গীয় উদ্যানের সুগন্ধের স্পর্শ পাই। অকৃত্রিম ভালোবাসার জগতে বড়দের মতোন কোনো মনোবিকার, কোনো গ্লানি, ঘৃণা, বিদ্বেষ কিংবা পরশ্রীকাতরতার বিন্দুমাত্র ছায়া নেই। যেমন আজ আমার চারপাশে দেখতে পাচ্ছি প্রেমশূন্য এই যুগের পাপক্লিষ্ট বিদ্বিষ্ট আত্মার উৎকট দুর্গন্ধ। যেখানে শিশুদেরও অধিকার নেই নিরাপদে বসবাস করার। যেখানে তাদের প্রতিও ঘৃণা এবং নিষ্ঠুরতার চাবুকগুলো আস্ফালন করছে ক্ষমতার রাজনীতির অপদেবতাকূল। অথচ আমাদের শৈশবের চিত্র এমন বিকৃত ছিলো না। সেখানে শিশুরা কোনো রক্তচক্ষুর ভয়ে বেতসলতার মতো কম্পিত হতো না। বরং তারা স্নেহের সহজাত অনুভূতি নিয়েই বিপন্ন আরেকটি শিশুকে হাত বাড়িয়ে দিতো বাঁচার আশ্বাস। যে আশ্বাসে আনন্দিত

www.amarboi.org

ভুবনটি এখন কেবলই একটি সোনার হরিণ।"

দেখছো কত সুন্দর কথা বলেছেন তিনি। এমন সুন্দর কথা আর কে বলবে তোমাদের? আর কখনো আসবে না তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে কেমন আছ ছোট্ট বুদ্ধরা। অথবা গোল করে একসাথে বসে গল্প করতেও আসবে না কখনো। কখনো আসবে না শত শত শিশুদের নিয়ে বাসের ভেতর হল্লা করে বনভোজনে যেতে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে টগবগ করে হাসিমুখে বলবে না, আমিই শাহজাদা। কারণ ২০০২ সালের ১৫ জুন দিবাগত রাতে নূরী ভাই চিরতরে বিদায় নিয়ে গেলেন অন্যরাজ্যে। যে রাজ্য থেকে তিনি আর কখনো ফির আসবেন না।

সবকিছু আজ থমকে গেছে
স্বপ্নপুরী ফুলমেলা
গল্প রাজা ঘুমিয়ে গেছে
বন্ধ হলো সব খেলা।
আর কখনো সবার মাঝে
করবে না তো গল্প সে
পঙ্খীরাজে সোয়ার হয়ে
চলে গেলেন পর-বাসে।
বন্ধুরা আজ তোমরা সবে
খোদার তরে তোলো হাত
বেহেশতটা পায় যেন সে
কাটতে পারে আঁধার রাত।

www.amarboi.org

কবি গোলাম মোহাম্মদ

"সেই নদীটির পা চলে না দিন কাটে তার দুঃখে
দীর্ঘশ্বাসে হৃদয় জ্বলে বালুর পাহাড় বুকে
সেই নদী যে মলিন হলে দুঃখে ভাসে দেশ
বিবর্ণতায় দুঃস্থ করুণ শ্যামল প্রতিবেশ।
চোখ জুড়ানো রূপ ছিলো তার যেন ভাটির মেয়ে
খুশির ধারা বুক ভরে তার চলতো হেসে গেয়ে।
সেই মেয়েটির মায়ার মুখে আজকে দুঃখের বিষ
চন্দনা আজ গান ভুলেছে সেই দোয়েলের শীষ।"

আচ্ছা বান্ধুরা, তোমরা কি বলতে পারো এই কবিতার লাইন কয়টি কার? হ্যাঁ, আমার মনে হয় হিজল বনের কবির কথা তোমরা এখনো ভুলে যাওনি। হিজল বনের কবিকে কে না চিনতো। কে না পড়তো তার মজার মজার কবিতাগুলো। যেমন কবিতা তেমন গান। হিজল বনের পাখি খুঁজতে খুঁজতে এক সময় কবি নিজেও আমাদেরকে রেখে হারিয়ে গেলেন। তার লেখাই তো-

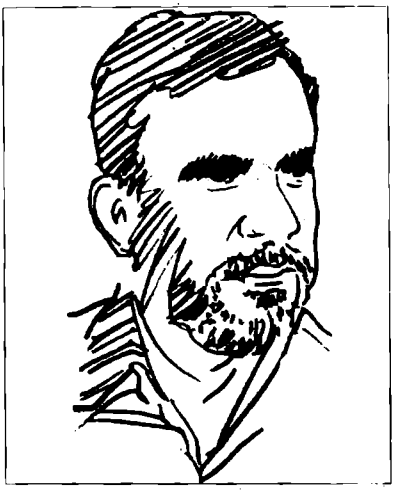

'হিজল বনে হারিয়ে গেছে পাখি
তাইতো তারে করুণ কেঁদে
ডাকি।'

আজ আর হিজল বনের কবি আমাদের মাঝে নেই। পাখির খোঁজে তিনি নিজেও হিজল বনে হারিয়ে গেলেন। ফলে আমরাও আজ করুণ কেঁদে তাকে খুঁজি। কতো পাখিকে জিজ্ঞেস করি, তোমরা কি

www.amarboi.org

হিজল বনের কবিকে দেখেছো? কিন্তু কেউ তাঁর সন্ধান দিতে পারে না।

আমাদের নতুন বন্ধু যারা, তারা হয়তো বলতে পারে হিজল বনের কবি আবার কে? হ্যাঁ বন্ধু, হিজল বনের কবির কথাই তো বলছিলাম। তা হলে শোন। তোমরা কি মধুমতি নদীর কথা শুনেছ? তাহলে চলো না আমরা কবির ভাষায় মধুমতিকে চেনার চেষ্টা করি-

ধানের পাটের সবুজ দোলায় ব্যথা করে তার চুরি
সরিষা মশুর তিল তিষি গম উম উম ঝুরি ঝুরি
চিত্রা-গঙ্গা মধুমতি দেয় সান্ত্বনা চিরকাল।

মাগুরা জেলা থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরে মোহাম্মদপুর থানা। এই থানার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন হিজল বনের কবি গোলাম মোহাম্মদ। যে মধুমতি নদীকে ঘিরে কবির লেখা কবিতা শুনালাম সেই মধুমতির পাড়েই গোপালনগর গ্রামের একটি বাড়িতে জন্ম হয়েছে তাঁর। সে দিনটি ছিলো ১৯৫৯ সালের ২৩ এপ্রিল। কবির পিতার নাম আবদুল মালেক। কবি যে বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে বাড়ি আজ আর নেই। মধুমতি নদী ভেঙ্গে নিয়ে গেছে তার জন্মভূমির বসত ভিটা। আজ শুধু বাড়ির একটি অংশ নদীর পাড় কবির স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। মধুমতির পাড়ে গেলে সত্যি কবির কথা মনে করিয়ে দিবে। মনে হবে এইতো এখানেই তো কবি ভূমিষ্ঠ হয়ে কেঁদে উঠেছিলেন। ভাবতে ভাবতে তুমি যখন মধুমতির তীর ধরে হাঁটবে তখন হয়তো তোমার কল্পনায় ভেসে আসবে কবির গান-

"পদ্মা নদীর পাড়ের মতো ভাঙ্গে কেন মন"

মধুমতির পাড়ে গেলে সত্যি মন ভেঙ্গে যাবে-কবিকে হারানোর ব্যথায়। কি বলতে কি বলে ফেললাম তোমাদের। বলছিলাম কবির জন্মস্থানের কথা।
কবিরা ছিলেন ৫ বোন দু'ভাই। ভাইদের মধ্যে কবি প্রথম। তাঁর ছোট ভাই গোলাম আহমদ। কবি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। একটু বড় হলেই বাবা তাকে গ্রামের মক্তবে ভর্তি করে দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেন। তারপর তাকে ভর্তি করে দেয়া হলো গোপালনগর প্রাইমারী স্কুলে। ভাল ছাত্র। ক্লাসে সবাই তাকে আদর করে। লেখা-পড়ায় বেশ ভালো। এই স্কুল থেকেই তিনি ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি লাভ করেন।

মোহাম্মদপুর পাইলট স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল হাই মাস্টারের নজর পড়লো কবি গোলাম মোহাম্মদের দিকে। তিনি তাঁকে তার স্কুলে নিয়ে ভর্তি করে দেন। এই স্কুল থেকে কবি অষ্টম শ্রেণীতেও বৃত্তি লাভ করেন। তারপর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১ম

www.amarboi.org

শ্রেণীতে মেট্রিক পাস করেন। তারপর তিনি ঝিনাইদা কেসি কলেজে ভর্তি হন। কৃতিত্বের সাথে আইএসসি ও বিএসসি পাস করেন। তখন কবি ঝিনাইদাহ সদরের মতুরাপুর গ্রামে থাকতেন।

কবি গোলাম মোহাম্মদ যেমনি ছিলেন ভালো ছাত্র তেমনি গান ও ফুল দুয়ের প্রতিই ছিলো তাঁর প্রাণের টান। ভোরবেলায় তিনি তুলে আনতেন নানান ফুল। আর ফুলের মতো সুন্দর ছিলো তাঁর মন। ফলে তিনি সারাক্ষণ গন্ধ বিলিয়ে বেড়াতেন। তাঁর গ্রামের দিনগুলো ছিলো অত্যন্ত মধুর। পড়া-শোনা, গান, ফুল, মাঠের শোভা এসব নিয়েই কাটাতেন। সেখানকার স্কুলের পড়া শেষ করে পাড়ি জমাতে হয় শহরে। ছেড়ে আসতে হয় প্রিয় মধুমতি। যে মধুমতি ছিলো তার নিত্যসঙ্গী। কি শীত কি গ্রীষ্মে লাফ দিয়ে পড়তেন নদীতে। সাঁতার কাটতেন, নদীর পানিতে খেলতেন। বিকেল হলে মধুমতির তীর ঘেঁষে হেঁটে বেড়াতেন। আওড়াতেন কবিতা-গাইতেন গান। এখন আর মধুমতির তীরে কেউ হাঁটে না, গান গায় না, বিড়বিড় করে আবৃত্তি করে না। আর কেউ বেল না, মধুমতি তুমি আমার জন্মভিটা কেড়ে নিলেও তুমি আমার বন্ধু। তোমার বুকে লুকিয়ে আছে আমার বসত ভিটা। তুমি তাকে আঁকড়িয়ে ধরে রেখো-

স্বপ্ন যেন ঝিলের শালুক ফুল
দুঃখ যেন খুকীর নরম চুল
কান্না এলে চাঁদকে পড়ে মনে
মন উড়ে যায় কনক চাঁপার বনে
চলছি ভেসে তুফান তুফান গতি
বন্ধু আমার পদ্মা-মধুমতি।

একসময় কবি গোলাম মোহাম্মদ ঢাকায় চলে এলেন। ঢাকায় এলে তাঁর তুলিতে আঁকতে লাগলেন গান, কবিতা, ফুল, ছবি আরো কত কি। তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম ছিলো "শিল্পকোণ"। পত্র-পত্রিকায় ছাপা হতে লাগলো তাঁর কবিতা। শিল্পীর কণ্ঠে বাজতে লাগলো তাঁর লেখা গান। সবার মুখে একটি নাম কবি গোলাম মোহাম্মদ। সবার হৃদয় জয় করে নিলেন তিনি। শত শত গান, কবিতা লিখলেন তিনি। জাতির জন্য রেখে গেলেন বিরাট সম্পদ। কবি গোলাম মোহাম্মদ ছিলেন অত্যন্ত সৎ। অর্থের প্রতি কখনো তাঁর লোভ ছিলো না। তিনি সব সময় হাসি-খুশি থাকতেন। ফলে অসুস্থ হওয়ার পর তিনি অনেক অর্থ-কষ্ট ভোগ করেন। কিন্তু কখনো কারো কাছে হাত পাতেননি। মাথা নত করেননি। না খেয়ে থাকলেও নিজের কষ্টের কথা কাউকে বলতেন না। তিনি অতি সাধারণভাবে চলাফেরা করতেন।

www.amarboi.org

ফলে হয়তো অনেকে কবি গোলাম মোহাম্মদকে চিনতে পারেননি। কবি গোলাম মোহাম্মদ ২০০২ সালের ২২ আগস্ট মাত্র ৪৩ বছর বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তার একটি কবিতাই আজ আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়-

পাখি
পাখিরে তোর ঈমান বড়ই পাকা
আহা!
তোর গানে যে মনের বিনয় মাখা
তুই কি এমন পেতে পাড়ি
দু'ভাগ করে বসত-বাড়ি
যাসরে উড়ে হৃদয় করে ফাঁকা
পাখি
পাখিরে তোর ঈমান বড় পাকা।

www.amarboi.org

তৃতীয় খন্ড

www.amarboi.org

সূচীপত্র

চাখার-এর সেই ছেলেটি/৮৯
মাওলানা আকরম খাঁ/৯২
এক সেবকের জীবন কথা/৯৪
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ/৯৬
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ/৯৯
শিল্পী আব্বাস উদ্দীন/১০৩
ঠান্ডার বাপ টুনু মিয়া/১০৭
দানবীর নবাব সলিমুল্লাহ/১০৯

www.amarboi.org

চাখার-এর সেই ছেলেটি

তোমরা কি শেরে বাংলার নাম শুনেছ? যাকে বাংলার বাঘ বলা হতো। শেরে বাংলা কিন্তু তাঁর আসল নাম নয়। তাঁর আসল নাম আবুল কাসেম ফজলুল হক। ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর, শুক্রবার শেরে বাংলা জন্মগ্রহণ করেন। বরিশাল জেলার রাজাপুর থানার সাতুরিয়া গ্রাম। এই গ্রামেই তাঁর নানার বাড়ি, আর এই বাড়িতেই শেরে বাংলার জন্ম। পিতার নাম কাজী ওয়াজেদ আলী। তিনি ছিলেন একজন নামকরা উকিল। শেরে বাংলার পিত্রালয় বরিশাল জেলার চাখার গ্রামে। এই গ্রামেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মহাপুরুষ শেরে বাংলার অনেক স্মৃতি।

বরিশালের চাখার গ্রামটি সত্যি সুন্দর। তোমরা কখনো এখানে এলে মনে হবে শেরে বাংলা এখনো জীবিত আছেন। এই গ্রামের মাটি ও মানুষের সাথে এখনো জড়িয়ে আছে কত স্মৃতি কথা। তোমরা কি বলতে পারো কোন্ লোকটি পাঁচ জোড়া নারিকেল নিয়ে গাছ থেকে তরতর করে নেমে যেতো, আবার ঘুষি মেরে নারিকেল ছিলে খেয়ে ফেলতো? সে আর কে, এই গ্রামেরই ছেলে ফজলুল হক। এক সাথে বাইশটি ডাবের পানি খেয়ে পেটে হাত বুলিয়ে বলতো, কি আরো দাও, সাগরে

www.amarboi.org

ঢেলে দেই।'

চাখার গ্রামের আনাচে কানাচে দৌড়, ঝাপ, সাঁতারকাটায়, লাঠিখেলা, পাঞ্জা লড়া, কাবাডি খেলা, গাছে চড়া-এসবের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুব বেশী। লেখাপড়ায়ও কেউ তার সাথে পেরে উঠতো না। প্রতিযোগিতার কথা উঠলে হুংকার দিয়ে ওঠতো। শরীরটাও ছিল তার বিশাল দৈত্যের মতো। কোন কিছুতেই সে হার মানতো না। একবার যা পড়তো তা আর দ্বিতীয়বার পড়তে হতো না। একদিনের ঘটনা, শেরে বাংলা পড়তে বসেছে। পড়তে পড়তে যখন এক পৃষ্ঠা পড়া শেষ হয়েছে, তখন ঐ পৃষ্ঠাটি ছিঁড়ে ফেলছে। এমন সময় শিক্ষক পৃষ্ঠা ছিঁড়তে দেখে তাকে ধমক দিলেন। জবাবে তিনি বলেন, আমার এক পৃষ্ঠা একবার পড়লে আর পড়তে হয় না। তাই ছিঁড়ে ফেলছি, তা হলে বুঝতেই পারছো কেমন মেধাবী ছাত্র ছিলেন আমাদের শেরে বাংলা।

চাখার গ্রামের এই দুরন্ত ছেলেটি দেখতে দেখতে দৈত্যের মতো বড় হয়ে গেলেন। বড় হয়ে ওকালতী শুরু করেন। তখনকার দিনে জমিদারের লোকেরা খাজনা আদায়ের নামে চাষীদের উপর অত্যাচার করতো, কেড়ে নিত তাদের ভাতের থালা। এসব দেখে শেরে বাংলার দুঃখ হতো। তিনি তখন ইংরেজদের হাত হতে চাষীদের থালা -বাটি, ঘরবাড়ি, জায়গা-জমি সব উদ্ধার করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। সত্যি, তা এক সময় বাস্তবে রূপ নিল। পরবর্তীতে যখন এই শেরে বাংলা দেশের মন্ত্রী হলেন তখন তিনি গরীব চাষীদের শত শত বছরের দায়-দেনা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। জমিদারী প্রথা চিরদিনের জন্য উচ্ছেদ করে জমি জমার ওপর চাষীদের অধিকার কায়েম করেন।

চাখার গ্রামটিকে এক সময় যে ছেলেটি মাত করে তুলতো সেই ছেলেটি এখন আর নেই। সে চলে গেছে দূরে, বহুদূরে পরজগতে। নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে সারাটি গ্রাম। দেখলে মনে হবে, যেন সারাটি গ্রামই একটি যাদুঘর। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তার পিতা-মাতাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাদের মৃত্যুর পর তিনি নিয়মিত বাড়ির সামনে পিতা-মাতার কবরের পাশে কোরআন শরীফ পড়তেন। যে স্থানে তিনি বসে কোরআন শরীফ পড়তেন সেই স্থানটি এখনো একই অবস্থায় আছে। কেউ দেখলে মনে হবে শেরে বাংলা এই মাত্র কোরআন পাঠ শেষ করে বাড়ি ফিরেছেন। কি অদ্ভুত সে সব স্মৃতি।

শেরে বাংলা চাখারে যে ছোট্ট দালানটিতে থাকতেন তা আজো আছে। কে বলবে এই ছোট্ট ঘরটিতে এক সময় দৈত্যের মতো একজন বীর বাস করতেন। তার পাশেই যাদুঘর। পারিবারিকভাবে গঠিত যাদুঘরটিতে শেরে বাংলার ব্যবহৃত

www.amarboi.org

বিছানা, চেয়ার, পাঞ্জাবী, চাদর, জুতা, বই পুস্তক, আলমিরা ও যে কোরআন শরীফটি তিনি পড়তেন তা সংরক্ষিত আছে।

বাড়ির সামনে ছোট্ট একটি খাল। খালের উপর একটি ব্রীজ, এই ব্রীজ থেকে একটি সরু রাস্তা তাঁর বাড়ির দিকে গেছে। আজকে গেলে কেউ বলবে না এই চিকন রাস্তা দিয়ে এক সময়কার একসাথে ২২টি ডাব ভক্ষণকারী দৈত্যের মতো একজন বীর প্রতিদিন হেঁটে যেতেন নিজ বাসগৃহে। খালের পাড়ে ছোট্ট একটি রেস্ট হাউস আছে। এখানে প্রতি বছর শীতকালে লোকজন বনভোজনে আসে। অথচ এখানে দেখার মতো কিছুই নেই। শুধু এটাই আছে দেখার মতো, তা হলো যার কীর্তিময় ইতিহাস সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে সেই বীর পুরুষটি এই রাস্তা দিয়ে এক সময় প্রতিদিন যাতায়াত করতেন। তাঁর সুখ-দুঃখের স্মৃতিময় ইতিহাস লুকিয়ে আছে এই চাখার গ্রামে। এখানে এলে সত্যি মনে হবে, এই বুঝি শেরে বাংলা এলো সবার পাশে। পুরো চাখার গ্রামটিই যেন শেরে বাংলার রূপে রূপায়িত হয়ে শত বছরের স্মৃতি বহন করে আছে।

শেরে বাংলা আজ নেই। আছে তাঁর স্মৃতি। ঈদুল ফেতর, কোরবানী, মহররম এসব উৎসবে গরীবদেরকে পোলাও, কোর্মা, কালিয়া, রেজালা, জর্দা, ফিরনি রান্না করে এখন আর কেউ দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায় না। চাখার গ্রামে গরীবদের সাথে বসে এখন আর কেউ খেতে বসে না। রাস্তা দিয়ে কোন এতিম শিশু ক্ষুধায় কাতর হয়ে কাঁদতে থাকলে এখন আর কেউ জিজ্ঞেস করেন না, "কি বাবা, তুমি কাঁদছো কেন"? "তোমার কিসের কষ্ট"? যে বুড়োটি শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে তাঁর কষ্ট দেখে নিজের গায়ের দামী চাদরটি তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে ঘর থেকে একটি কাথা নিয়ে গায়ে জড়িয়ে নিজের শীত নিবারণ করলেন। সেই মহাব্যক্তিটিকে এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কত হাজার হাজার বৃদ্ধ শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে কেউ তাদের খোঁজ নিতে এখন আর আসে না।

এই ছিলেন গরীবের বন্ধু শেরে বাংলা, প্রাণ উজাড় করে সাহায্য করতেন তাদেরকে। এই মহান নেতা ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল ৮৯ বছর বয়সে চলে গেলেন পরজগতে। কিন্তু রেখে গেছেন আমাদের সবার জন্য তাঁর অনুকরণীয় আদর্শ।

www.amarboi.org

মাওলানা আকরম খাঁ

ভারতের চব্বিশ পরগনার বশির হাট মহকুমার হাকিমপুর গ্রাম। এই গ্রামেরই একজন বাসিন্দা, নাম তাঁর মাওলানা আবদুল বারী খান। তিনি মুজাহীদ আন্দোলনের একজন নেতা। তাঁর পিতা তোরাব আলী খান ছিলেন শহীদ তিতুমীরের একজন শিষ্য। তাঁর আর একজন পূর্বপুরুষ বালাকোটের যুদ্ধে শহীদ হন। এই সংগ্রামী পরিবারে ১৮৬৮ সালের ৭ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন মাওলানা আকরম খাঁ।

পিতামাতার আদরের সন্তান আকরম খাঁ প্রথমে মক্তবেই সাধারণ শিক্ষা শুরু করেন। মক্তবে তিনি কোরআন শরীফ ছাড়াও শেখ সাদীর 'গুলিস্তা ও বোস্তা' পাঠ করেন। কিন্তু পিতা-মাতার তত্বাবধানে ও স্নেহে আকরম খাঁ বেশীদিন পড়াশুনা করতে পারেন নি। মাত্র এগার বছর বয়সে একই দিনে তাঁর পিতা-মাতা দু'জনই কলেরা রোগে ইন্তেকাল করেন। তারপর তাঁর নানা ও বড় ভাইয়ের তত্বাবধানে বড় হতে থাকেন। এই ভাবে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে এফ,এম পরীক্ষায় পাস করেন।

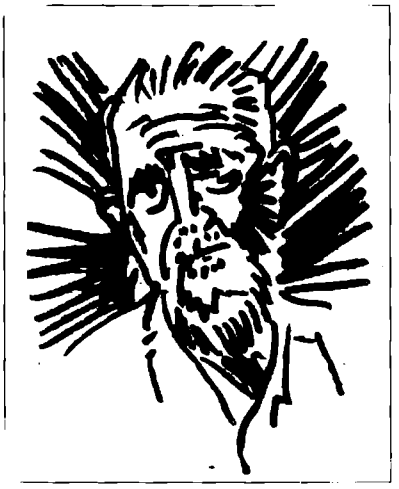

আরবী-ফারসী ভাষাতে তিনি বেশ দক্ষ ছিলেন। তিনি ফরাসীতে অনেক কবিতা লিখেন। কিন্তু তাঁর বড় ভাই কবিতা লিখা পছন্দ করতেন না। একবার তিনি মাওলানার লেখা কবিতার পান্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলেন।

www.amarboi.org

এরপর আকরম খাঁ কবিতা লেখা ছেড়ে দেন।

মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা পাসের পর তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। সংবাদপত্র পাঠের প্রতি তাঁর ছোটবেলা থেকেই ঝোঁক ছিল। সংবাদপত্র পাঠ করতে করতেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা শুরু। তিনি দেখলেন মুসলিম জাতি শিক্ষাদীক্ষায় সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছে। তাই মুসলমান জাতিকে টেনে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাইতো ১৯০৪ সালে তিনি 'মোহাম্মদী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তারপর তিনি দৈনিক 'আজাদ' সহ প্রচুর পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন। মুসলিম সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখেছেন তার জন্য তিনি সারা জীবন ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে থাকবেন। তিনি মুসলিম জাগরণে যে অবদান রেখে গেনে তা জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে।

তিনি নিজের দেশকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। তাই তাঁর চলন-বলন, আচার-ব্যবহার, পোশাক-আশাক সবকিছুতেই দেশপ্রেম ছিল। মওলানা আকরম খাঁ সরল জীবন যাপন করতেন। তিনি ছিলেন বিনয়ী ও অনাড়ম্বর জীবনের অনুসারী। ১৯২৮ সালে হজ্জে গিয়ে মওলানা যে পোশাক পরিধান করেছিলেন, তা দেখে আরবের বাদশাহ ইবনে সউদ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। ইবনে সউদ তাঁর পরিষদকে বলেছিলেন, "তাঁর দেশের কল্যাণের জন্যেই তিনি খদ্দরের পোশাক পরেছেন। তাঁর মোটা কাপড় পরার কারণ হলো এটা তাঁর দেশের তৈরী।" মওলানা মাথায় সবুজ পাগড়ী পরতেন, গায়ে সাদা জামা, মাথায় সাদা টুপী, এগুলো সবই ছিল মোটা কাপড়ের তৈরী।

মাওলানা ছিলেন বেশ অমায়িক, সব সময় রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে খুব পছন্দ করতেন। তিনি খুব পড়াশুনা করতেন। সত্যের পক্ষে সব সময় ছিলেন সোচ্চার। এমনি ভাবে সাংবাদিকতা, রাজনীতি, সংগ্রামী জীবন কেটে তাঁর বয়স এসে দাঁড়িয়েছে একশ'র কোটায়। বয়সের ভারে তিনি নুইয়ে পড়েননি। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। নানা রোগে পেয়ে বসলো তাঁকে। কিন্তু এই রোগ থেকে আর মুক্তি পেলেন না। অবশেষে ১৯৬৮ সালের ১৮ আগস্ট তিনি পি.জি. হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

জাতি হারালো একজন নেতাকে, একজন সমাজ সংস্কারককে। তিনি নেই, কিন্তু আজও তাঁর আজাদ আছে। আছে তাঁর কর্ম, আদর্শও প্রেরণা। আমাদের আজাদী আন্দোলন, সংবাদপত্র আন্দোলন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্দোলনে মাওলানা আকরম খাঁ অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি এজাতির কাছে।

www.amarboi.org

এক সেবকের জীবন কথা

হাজী মোহাম্মদ মোহসীন পৃথিবীর একটি দেশে জন্মগ্রহণ করেও আজ তিনি সব দেশের মানুষের কাছে পরিচিত। তাঁর কাহিনী এমন ভাবে ছড়িয়ে আছে যে রূপকথার কল্প কাহিনীকেও তা হার মানায়। সারাটা জীবন নিজের সমস্ত ধন সম্পদ দু'হাতে বিলিয়ে গেছেন তিনি অসহায় মানুষের সেবায়।

অনেক দিন আগের কথা। তখন ইংরেজি ১৭৩০ সাল। এই সালেই পশ্চিম বাংলার হুগলী নগরীতে হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের জন্ম। তাঁর পিতার নাম আগা ফয়জুল্লাহ, মাতার নাম জয়নব খানম। হাজী মোহসীনের পূর্ব পুরুষ অত্যন্ত ধনী ছিলেন। তাঁরা আগে পারশ্য দেশের অধিবাসী ছিলেন।

হাজী ফয়জুল্লাহ এক জমিদারের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করেন। সেই জমিদারের নাম ছিল আগা মোতাহার। আগা মোতাহার ১৭২৯ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর সংসার অভিভাবক হীন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। এক মাত্র নাবালিকা কন্যা মনুজানকে রেখে তিনি চির বিদায় নেন।

এই সময়ে তাদের পরিবার ও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার জন্য একজন

www.amarboi.org

বিশ্বস্ত অভিভাবকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।তাই এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মুরাই থেকে ফয়জুল্লাকে আনা হলো। তিনি এসে সমস্ত ভার নিলেন। আর এই পরিবারের বিষয় সম্পত্তির মালিক হলেন মনুজান।

এক সময় জমিদারের বিধবা স্ত্রী জয়নব খানমের সাথে ফয়জুল্লার বিয়ে হয়। আর তাদের কোল আলোকিত করেই জন্ম নেয় হাজী মোহসীন। তখন মনুজানের বয়স মাত্র বার বছর। মনুজান ও মোহসীন সৎ ভাই বোন হলেও মনুজান মোহসীনকে আপন ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন।

মোহসীন দিনদিন বড় হতে লাগলেন। এক সময় তাঁকে তৎকালীন নাম করা পণ্ডিত সিরাজী সাহেবের কাছে পড়াশুনা করার জন্য পাঠানো হলো। অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরবী, ফারসী শিক্ষা শেষ করেন। এরপর তিনি গিয়ে ভর্তি হন মুর্শিদাবাদের এক মাদ্রাসায়। মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করে তিনি স্থানীয় নবাবের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। অল্পদিন পর তিনি আবার বোন মনুজানের কাছে চলে আসেন। এরপর তাঁর সখ জাগলো দেশ ভ্রমণের।

তোমরা হয়তো জানো সেকালে উড়োজাহাজ, রেলগাড়ি, মোটর গাড়ি কিছুই ছিল না। একদেশ থেকে অন্য দেশে পায়ে হেঁটে যেতে হতো। তার উপর আবার ছিল চোর ডাকাতের ভয়। ৩২ বছর বয়সে ১৭৬২ সালে মোহসীন পদব্রজে ভ্রমণে বের হন। দিনের পর দিন রাতের পর রাত মাসের পর মাস ভ্রমণ করে বহু শহর বন্দর জঙ্গল পেরিয়ে ২৮ বছর পর তিনি আবার ফিরে এলেন জন্মভূমিতে।

অনেক দিন পর আবার ভাই-বোনের দেখা। মনুজান এখন আর ভাইকে কোথায়ও যেতে দিতে চায় না। তিনি মোহসীনকে বলেন, "আমাকে অসহায়ভাবে ফেলে রেখে আর কোথাও যেতে পারবে না।" এদিকে মনুজানের ও কোন ছেলে মেয়ে ছিল না। ১৭৫২ সালে মীর্জা সালাউদ্দীনের সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। মাত্র পাঁচ বছর পর ১৭৫৭ সালে নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি সৎভাই মোহসীনকে সব সম্পত্তি দিয়ে যান। ৮১ বছর বয়সে ১৮০৩ সালে মনুজান ইন্তেকাল করেন।

হাজী মোহসীনের ধন সম্পত্তির প্রতি লোভ লালসা ছিল না। তিনি ১৮০৬ সালে নিজের সমস্ত সম্পত্তিই দান করে দেন। আজও এসব দানপত্রের কাগজ পত্র হুগলিতে সংরক্ষিত আছে। শুধু কি তাই? নিজের গায়ের জামা কাপড় পর্যন্ত অন্যদেরকে দান করে দিতেন হাজী মোহসীন। বিলাসিতা ও আরাম-আয়েস তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইমামবাড়ী প্রাসাদে বাস করতেন না। ইমামবাড়ীর পাশে একটি ছোট্ট কুটিরে বাস করতেন। আর কোরআন শরীফ নকল করে যা পেতেন তা দিয়েই চলতেন। নিজ হাতে রান্না করে চাকর বাকরদের নিয়ে একসাথে বসে খেতেন। ১৮১২ সালের ২৯ নভেম্বর ৮২ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.amarboi.org

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ছেলেটিকে দেখলে ক্লাসের সবাই ভয় পেতো। কারণ ক্লাসের অনেকেই তার হাতে মার খেয়েছে। ফলে স্যারের কাছে অনেক বিচার পড়তো। যেমন ছিলেন ভাল ছাত্র আবার তেমনি ছিলেন চঞ্চল। তাই স্যার তাঁকে আদর করতেন। কিন্তু অন্যায় কাজের জন্য শাস্তিও দিতেন। যার ফলে স্যারের ভয়ে অনেক সময় গায়ে কাপড় পেঁছিয়ে তার উপর কোট পরে স্কুলে আসতেন। মারলেও যাতে করে গায়ে না লাগে। আর তাইতো তাঁকে নিয়ে ক্লাসে হাসির ঝিলিক বয়ে যেতো। এমন গরমের দিনে কোট পরে স্কুলে আসলে এমনিতেই তো সবার মুখে হাসি আসবে। তার উপর কোটের ভেতর শাড়ি কাপড় পেঁচানো। আচ্ছা তোমরা কি বলতে পারো এই দুরন্তপনা ছেলেটি কে? হ্যাঁ তা হলে বলছি শোন।

চব্বিশ পরগণা জেলার বসির হাট মহকুমার পেয়ারা গ্রাম। এই গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নেন তিনি। পিতার নাম মফিজ উদ্দীন, মাতা হুরুন্নেসা খাতুন। সে দিনটি ছিল ১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই। পুত্র সন্তান লাভ করে পিতা মাতার আনন্দের সিমা নেই। যথা সময়ে সন্তানের আকিকা দেওয়া হলো। আকিকার দিন তাঁর

www.amarboi.org

নাম রাখা হলো মুহম্মদ ইব্রাহিম। মা আদর করে ডাকতেন শহীদুল্লাহ বলে। আবার অনেকে সদানন্দ বলেও ডাকতো। তোমরা আবার ভাববে, সদানন্দ আবার কেমন নাম। সদানন্দ বলারও কারণ আছে। কারণ হলো তিনি সব সময় হাঁসি-খুঁশি, আনন্দের মধ্যে থাকতেন, তাই সবাই তাঁকে সদানন্দ বলে ডাকতেন। তিনি নিজের নাম রাখলেন জ্ঞানানন্দ স্বামী। তার অর্থ হলো জ্ঞান লাভ করে যে আনন্দ পায়।

খুব চঞ্চল ছিলেন বালক শহীদুল্লাহ। হৈচৈ করে গ্রামের এ পাড়ায় ওপাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন। প্রায় বাবার কাছে বিচার আসতো। বাবা তার জন্য সব সময় অস্থির থাকতেন। তবে ছেলের জ্ঞান বুদ্ধি দেখে বাবা আশাবাদী।

গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করে দেয়া হলো শহীদুল্লাহকে। নিয়োমিত পড়া লেখা করছে। বাবা ছিলেন একজন চাকুরী জীবি। তাঁর কর্মস্থল ছিলো হাওড়ায়। শহীদুল্লার বয়স যখন দশ বছর তখন বাবা তাঁকে হাওড়ার মধ্য স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। এই স্কুলেই ভাল ফল করায় তাঁকে রৌপ্য পদক উপহার দেয়া হয়। তারপর তিনি গিয়ে ভর্তি হলেন হাওড়া জেলা স্কুলে। এখান থেকে তিনি ১৯০৪ সালে এন্ট্রাস পাশ করেন। তারপর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে শুরু করেন উচ্চ শিক্ষা। প্রখর স্মৃতিশক্তি তাঁর। একবার যা পড়তেন তাই মনে গেঁথে ফেলতেন। ১৯০৬ সালে তিনি এফ এ পাশ করেন। কিন্তু একবারে বি এ পাশ করা হলো না। দুইবার পরীক্ষা দিয়ে বি এ পাশ করেন। তারপর সংস্কৃতিতে এমএ পড়ার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। তখনকার দিনে হিন্দু শিক্ষকরা চাইতো না কোন মুসলমান ছাত্র অনেক বিদ্যা শিখে বড় হোক। শহীদুল্লার মুখে দাঁড়ি দেখে এক হিন্দু শিক্ষক বুঝতে পারলেন তিনি মুসলমান। তাই তাঁকে এই বিষয়ের উপর পড়ার সুযোগ দিলেন ভাষা তত্ত্ব। এই ভাষা তত্ত্বের উপরই তিনি ১৯১২ সালে এম এ পাশ করেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক বিরাট পন্ডিতের নাম। যিনি এক সময় প্রাচ্যের চলন্ত বিশ্বকোষ নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর পান্ডিত্ব এক বিশাল সমুদ্রের মতো। তিনি সব সময় পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। লাইব্রেরীতে গিয়ে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতেন। মাঝে মধ্যে এমনও হতো কখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেলো তিনি টেরই পেতেন না। কখনো কখনো লাইব্রেরীর লোকজন তাঁকে ভিতরে রেখে দরজা জানালা বন্ধ করে চলে যেতেন। তাঁকে এক সময় জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি জীবনে কত বই পড়েছেন? তিনি বলেন, আমি কতো বই পড়েছি জানি না, তবে রাস্তার একটা ছিঁড়া কাগজ পেলেও আমি তা কুড়িয়ে নিয়ে পড়েছি। তা হলে তোমরা বুঝতেই পারছো ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কতো বড় একজন পন্ডিত ছিলেন।

তিনি এত জ্ঞান অর্জন, এত গবেষণার মাঝে ব্যাস্ত থাকা সত্ত্বেও তোমাদের

www.amarboi.org

মতো ছোট্ট বন্ধুদের কথা মোটেও ভুলেননি। তোমরা কি কখনো আঙ্গুর দেখেছো? আঙ্গুর দেখতে কেমন? খুব টস টসে তাই না? বলতেই যেন জিবে পানি চলে আসে। আর তাইতো তিনি ছোটদের জন্য 'আঙ্গুর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। যা তিনি নিজেই সম্পাদনা করতেন। কি মিষ্টি নাম। টস টসে রসালো লেখায় ভরপুর থাকতো আঙ্গুরের প্রত্যেকটি পাতা। 'আঙ্গুর' কখন প্রকাশিত হয় জানো? ১৯২০ সালের বাংলা ১৩২৭-এর বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর কর্মময় জীবনের প্রায় সবটাই শিক্ষকতা করে কাটান। এই শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি লিখেছেন অজস্র লেখা। ইংরেজি, বাংলায় নানা নামে লিখা প্রবন্ধ সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। তাঁর প্রথম প্রবন্ধের বই "ভাষা ও সাহিত্য" প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে।

আঞ্চলিক ভাষায় অভিধান, বাংলা সাহিত্যের কথা, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত প্রভৃতি গবেষণামূলক বই আজো তাঁর কীর্তি বহন করছে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার জীবনযাপন ছিলো খুব সহজ সরল। তিনি অহেতুক ব্যয় করা পছন্দ করতেন না। খাবার ব্যাপারে তিনি সৌখিন ছিলেন। গরুর গোশ্ত ছিল তাঁর প্রিয় খাবার। নাস্তার সাথে ফলমূল খেতে পছন্দ করতেন। পাকা কলা, পেপে, আনারস, কমলালেবু তিনি বেশী খেতেন।

তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। ওয়াজ মাহফিলের কোন দাওয়াত পেলেই চলে যেতেন, সেখানে বক্তৃতা করতেন। নামাজ রোজার প্রতি কখনো অবহেলা করতেন না। তিনি ১৯৫৫ সালে হজ্জ পালন করেন।

অবশেষে এই মহান পুরুষ ১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই ৮২ বছর বয়সে চলে যান অনেক দূরে। জুলাই মাসে যে মহাপুরুষটির জন্ম সেই জুলাই মাসেই তাঁর মৃত্যু হলো। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। আছে তাঁর স্মৃতি সাহিত্য তার কর্মময় দিনগুলোর ইতিহাস।

www.amarboi.org

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

সুরমা, কুশিয়ারা, যমুনা, গোয়াই নদীর স্বচ্ছ পানিতে প্লাবিত সুন্দর ভূমির নাম সিলেট। অনেকে বলেন শ্রীহট্ট। সবুজ টিলা আর শ্যামল বর্ণের মাঝখানে ভারি সুন্দর জায়গা সিলেট। একদিকে ঝাউগাছের পাতায় বাতাসের মর্মর ধ্বনি। আরেক দিকে নির্জন দুপুরে পায়রাদের নিঃশব্দ উড়াউড়ি। অন্যদিকে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির চা বাগানে খাসিয়া মেয়েদের টুকরি ভরে চা পাতা সংগ্রহ দেখে মনে হয় আল্লাহ বুঝি অনেক মমতা অনেক যত্ন নিয়ে রঙিন তুলিতে এঁকেছেন এই অঞ্চলকে। খরস্রোতা পাহাড়ী নদী, আর কূলকিনারাহীন হাওর-এর আরেক সৌন্দর্য। স্ফটিক স্বচ্ছ পানিতে দরিয়ার মতো ঢেউ জাগানো হাওর, তার বুকে অজানা গন্তব্যের দিকে আপন মনে নৌকা বাইতে বাইতে কিশোর মাঝির কণ্ঠে গেয়ে ওঠে,

'ছাড়িলাম হাসনের নাওরে'।

এই হাসনের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। যাকে আমরা মরমী কবি হাসন রাজা নামে জানি। এই হাসন রাজার এক নাতির কথাই বলবো তোমাদের।

হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলবীবাজার

www.amarboi.org

ও সিলেট সদর এক সময় ছিল মহকুমা। আর এই চারটি মহকুমা নিয়ে এক সময় ছিল সিলেট জেলা। সুনামগঞ্জের এক নিভৃত পল্লীগ্রাম তেঘরিয়া। এই তেঘরিয়া গ্রামে নানা মরমী কবি হাসন রাজার বাড়িতেই জ্যোৎস্নার আলোকিত রাতে চাঁদের মতো ফুটফুটে একটি শিশু জন্ম নেয়। সেদিনটি ছিল ১৯০৬ খৃস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর, ৯ই কার্তিক শুক্রবার। তাঁর পিতার নাম দেওয়ান মোহাম্মদ আসফ। তিনি ছিলেন দুহালিয়ার জমিদার। আর মাতার নাম বেগম রওশন হোসেন বানু। শিশুটির নামরাখা হলো দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এই নামটি আমাদের সবারই পরিচিত। তিনি আমাদের দেশেরই একজন মনীষী ছিলেন। তাঁর শৈশব-কৈশোর কেটেছে গ্রামবাংলার আলো-ছায়ায়। যদিও তিনি জমিদার পরিবারের সন্তান ছিলেন। তবুও গরীব প্রজাদের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। তখন থেকেই তিনি দেখেছেন গ্রামের মুসলমান সমাজের দুরবস্থা। তা শুধু ভাত-কাপড় আর চিকিৎসার অভাবই নয়-তার চেয়েও বড় ছিল অস্তিত্ব ও মান-সম্মান নিয়ে টিকে থাকার প্রশ্ন। সে সময় কৃষক-মজুর প্রায় সকলেই ছিল মুসলমান। তাদের অবস্থা ছিল খুব খারাপ। জমিদার-জোতদাররা শিক্ষা ও সম্পদে ছিল অগ্রগণ্য। আর এই জমিদার-জোতদারদের হাতেই নানাভাবে অত্যাচারিত হতো গ্রামের দরিদ্র কৃষককুল ও দিনমজুর।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ শৈশবকাল থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন মুসলমান সমাজকে বাঁচাতে হলে চাই শিক্ষার আলো। শৈশবের সেই উপলব্ধিই ক্রমে ক্রমে তাঁকে কর্মবীর ও সাহিত্য সাধক করে তুলেছিলেন। আজীবন তিনি ক্লান্তিহীন কাজের মধ্যে ডুবে ছিলেন। তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল মানুষের কল্যাণ সাধন করা।

মায়ের নয়নের মণি আজরফের লেখাপড়া শুরু হলো বংশের রীতি অনুযায়ী মৌলবী সাহেবের কাছে। তিনি কুরআন শরিফ ও বোগদাদি কায়দা ও পণ্ডিত মশাইয়ের কাছ থেকে বাংলা ব্যাকরণ পাঠ নেন। ছেলেবেলায় অপর দশটি বালকের সঙ্গে মেতে থাকতেন তিনি। অবসর সময়ে হাওরের অতল পানি আর আকাশের সীমাহীন নীলের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। দেখতেন সাদা বলাকার ঝাঁক আকাশে উড়ে যাচ্ছে। দেখেন বিলের পানি আলো করে ফুটে আছে লাল শাপলা।

১৯১৩ সালে মাত্র সাত বছর বয়সে আজরফকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হলো। তিনি প্রথমে সিলেট মাধ্যমিক সরকারি বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পড়াশোনা শুরু করেন। পরে সুনামগঞ্জ জুবিলী হাইস্কুল থেকে ফার্সী বিষয়ে লেটার মার্কসহ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ভর্তি হন মুরারী চাঁদ কলেজে। এই কলেজ

www.amarboi.org

থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ লাভ করেন। ১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিস্টিং শনসহ বিএ এবং ১৯৩২ সালে দর্শন শাস্ত্রে এম,এ ডিগ্রী লাভ করেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সিলেটের গোলাপগঞ্জ মোহাম্মদ চৌধুরী একাডেমীতে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদানের মাধ্যমে শুরু করেন তার কর্মজীবন। পরবর্তীতে তিনি সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। এক সময় তিনি সুনামগঞ্জ কলেজেও যোগদান করেন। এই কলেজেই পরবর্তীতে তিনি ভাইস প্রিন্সিপাল হন। এর মাঝে তিনি নরসিংদী কলেজও মতলব কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে তিনি ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আবুজর গিফারী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ সাল থেকে ৮৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন, পরে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

এবার তা হলে আমরা এ মহান লোকটির সাহিত্যজীবন সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করি। ১৯১৮ সালে তিনি প্রথম গল্প লিখেন। আর এ গল্পটির শিরোনাম কি ছিল জানো? "শিয়াল মামা"। এই "শিয়াল মামা" গল্প লিখার মাধ্যমেই তিনি সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেন। তাঁর প্রথম কবিতার নাম ছিল "যাত্রী"। এই কবিতাটি ১৯২৫ সালে মুরারী চাঁদ কলেজের একটি ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সর্বসাকুল্যে ১০৭টি গল্প লিখেন। গল্পগ্রন্থ, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থসহ তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। বাংলা ও ইংরেজিতে তাঁর রচনার অধিকাংশ প্রবন্ধ। তোমরা তো ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সবাই জানো। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ একজন ভাষাসৈনিক ছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি আসাম আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সাল থেকে ইন্তেকাল পূর্ব পর্যন্ত তমদ্দুন মজলিসের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বহু সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এবং সব প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

তিনি তাঁর জীবনে বহু সম্মাননা ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার, বাংলা একাডেমী ফেলো নির্বাচিত, নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক, মুসলিম ওয়েলফেয়ার মিশন পুরস্কার, অতীশ দিপঙ্কর পুরস্কার, আকরম খাঁ স্বর্ণপদক, জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার স্বর্ণপদক, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্বর্ণপদক, আহসান উল্লাহ্ স্বর্ণপদক, জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার স্বর্ণপদক, আহসান উল্লাহ্ স্বর্ণপদক, জালালাবাদ যুব ফোরাম পুরস্কার, বাংলা সাহিত্য

www.amarboi.org

পরিষদ পুরস্কার, একুশে পদক, জগদীশ চন্দ্র বসু পুরস্কার, মঙ্গল সাহিত্য পুরস্কার, জাতীয় অধ্যাপকসহ অগণিত পুরস্কার তিনি পেয়েছেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন অমায়িক, শান্ত, ভদ্র ও সদালাপী মানুষ। তিনি বড়দের যেমন আনন্দ দিতে পারতেন, তেমনি তোমাদের মতো ছোট্ট বন্ধুদেরকেও অতি সহজে আপন করে নিতে পারতেন।

ধর্মের ব্যাপারে আজরফ ছিলেন নিবেদিত। নিজের ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান থেকেই তিনি লাভ করেছিলেন একটি স্বচ্ছ সুন্দর ধারণা। আল্লাহর নির্দেশ ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদর্শের মাধ্যমেই তিনি দেখেছেন শান্তি, সমৃদ্ধি ও মুক্তির পথ।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের শৈশব, কৈশোর কেটেছে গ্রামে। গ্রামের মুক্ত পরিবেশে মুক্ত মন নিয়ে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের সংগে মিশেছেন অবাধে। তাঁর সেই মেলামেশায় কোন সংকোচ অথবা দ্বিধা ছিল না। গ্রাম বাংলার নদী-নালায়, গাছপালা, পাখ-পাখালি অবারিত মাঠ প্রান্তর তাঁর শিশুমনে যতখানি রেখাপাত করেছিল তার চাইতে অনেক বেশী রেখাপাত করেছিল গ্রামবাংলার সরল ও দরিদ্র জন সাধারণ। দেওয়ান আজরফ তাঁর সাহিত্যকর্মে ও তার জীবনের বিশাল কর্মকাণ্ডে প্রমাণ রেখে গেছেন। ১৯৯৯ সালের ১ নভেম্বর ঢাকা হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে এই বড় মানুষটি ইন্তেকাল করেন।

www.amarboi.org

শিল্পী আব্বাসউদ্দীন

বাড়িতে বড় একটি ইঁদারা। তার ভেতর শব্দ করলে কেমন গুম গুম শব্দ করে উঠে। একটি ছেলে সেই ইঁদারায় ঝুঁকে গলা ছেড়ে গান গায়। গানের আওয়াজ অনেক বড় হয়ে সারা ইঁদারা ভরে তোলে। নিজের গানের এই ছড়িয়ে যাওয়া ধ্বনিতে নিজেহ মুগ্ধ হয়ে শোনে।

ছেলেটির প্রাণ গানের সঙ্গে বাঁধা। যা কিছু সুন্দর সবই প্রিয়। মাঠ, নদী পাখির ডাক, তারার আলো সবই তাঁর কাছে সুরে ভরা। সবই তাঁর গানের বিষয়। বাড়ির পূর্ব দিকে বিরাট মাঠ। মাঠ ছুঁয়ে যায় নদী, নদীর নাম কালজানি। গ্রীষ্মে ধূ ধূ করে মাঠ। হাওয়ায় হাওয়ায় কাঁপতে থাকে মাঠের ঘাস। তার মন ভরে উঠে গানে।

বর্ষায় সবুজ ধানে মাঠ ভরে যায়। সেই মাঠে কাজ করতে করতে চাষীরা গায় গান। লম্বা সুরের টানে ভরা গান। ভাওয়াইয়া সুরের গান শোনা মাত্রই সেই গান ছেলেটি শিখে ফেলে । তারপর একা একা গান গেয়ে বেড়ায়। স্কুলে যাবার পথে একটু আড়াল হয়েই সে গলা ছেড়ে ধরে ভাওয়াইয়া গান। কি আনন্দ হয় তখন। তার ইচ্ছা, বড় হয়ে সে নামকরা গায়ক হবে। লেখাপড়াও শিখবে অনেক।

বড় হয়ে সত্যি সত্যি এই ছেলেটি

www.amarboi.org

খুব নামকরা গায়ক হয়েছিলেন। গান গেয়ে এত নাম খুব কম মানুষই করতে পারে। সকল মানুষের মন তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন। এই ছেলেটির নাম আব্বাস উদ্দীন। পুরো নাম আব্বাস উদ্দীন আহমদ। বাবা মা আদর করে আব্বাস বলে ডাকতেন। পশ্চিম বাংলার কুচবিহার জেলার বলরামপুর গ্রামে ১৯০১ সালের ২৭ অক্টোবর আব্বাস উদ্দীনের জন্ম। পিতার নাম জাফর আলী আহমদ। আর মাতার নাম হিরামন নেসা।

আব্বাস উদ্দীনের গান কে না শুনেছে! শুধু নাম শোনা বা তাঁর কটি গান শোনাই যথেষ্ট নয়। তাঁর সম্পর্কে কিছু কথা জানতে হবে তোমাদের। তবেই না তোমরা বুঝতে পারবে বাংলা গানের জগতে তাঁর অবদান কতো।

আব্বাসউদ্দীনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গ্রামের স্কুল থেকে। খুব ভাল ছাত্র। তাঁর ছিল ফুটফুটে মিষ্টি ফুলের মতো চেহারা। আর গান ও ফুল দু'য়ের প্রতিই তাঁর প্রাণের টান। ভোর বেলা গিয়ে তুলে আনেন বেলীফুল, গন্ধরাজ, রেখে দেন তা বাবার শিয়রের কাছে। পড়া শুনা, গান, ফুল, মাঠের শোভা এসব নিয়েই কাটে তাঁর গ্রামে থাকার দিনগুলো। সেখানকার পড়া শেষ হলে বাবা তাঁকে কুচবিহার হাই স্কুলে পড়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেখানে তাঁর মোটেও ভাল লাগে না। বড় শহর। মাঠ নেই, ছায়া নেই, গ্রামের কোন রেশ নেই। হাঁপিয়ে উঠেন আব্বাস। তাঁকে নিয়ে আসা হয় তুফানগঞ্জ স্কুলে। তুফানগঞ্জে আব্বাসের বাবা ওকালতি করতেন। জায়গাটা খুব পছন্দ তাঁর। খোলা মাঠ, নদী ও অজস্র গাছের ছায়া মিলিয়ে গ্রামের রূপ খুঁজে পায় সে। নদীর ধারে গিয়ে গলা ছেড়ে গান গাওয়া যায়। মোবারক হোসেন নামে সেখানে এক সরকারী ডাক্তার ছিলেন। তিনি বেশ সুন্দর গান গাইতে পারতেন। স্কুলের কাছেই ডাক্তারের বাসা। ছুটির পর আব্বাস রোজই যান তাঁর কাছে। ডাক্তার তাঁকে গান শোনান। আর এক-দু'বার শুনেই আব্বাস তা শিখে ফেলেন।

স্কুলে গানের প্রতিযোগিতা হলো। গানে প্রথম হলেন আব্বাস উদ্দীন। তাঁর গান দিয়ে স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভা শুরু হলো। আবার তাঁর গান দিয়েই সভা শেষ হলো। তিনি প্রথমে গাইলেন-

"অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া"।

আর যখন সভা শেষ হচ্ছে তখন তিনি গাইলেন-

"সভা যখন ভাঙবে তখন শেষের গানটি যাব গেয়ে
হয়ত তখন কণ্ঠ হারা মুখের পানে রব চেয়ে"॥

www.amarboi.org

গান শুনে সবাই তখন আব্বাসের প্রশংসা করলেন।

ভালভাবে আব্বাস ম্যাট্রিক ও আই, এ পাশ করেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা লাখনৌ যাবেন। সেখানে রয়েছে গান শেখার বিখ্যাত কেন্দ্র মরিস সঙ্গীত কলেজ। কিন্তু আব্বা তাঁকে সেখানে যেতে দিলেন না।

এবার কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্যে এলেন রংপুরে। কিন্তু ভাল না লাগায় গিয়ে ভর্তি হলেন রাজশাহী কলেজে। সে সময় বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এলেন রাজশাহী শহরে। এ উপলক্ষে রাজশাহী কলেজে এক সংবর্ধন সভার আয়োজন করা হয়। ছাত্রদের সভায় আব্বাস উদ্দীন একটি নজরুল গীতি গাইলেন।

ঘোর-ঘোররে ঘোর-ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর
ঐ স্বরাজ রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর।

গান শুনে প্রফুল্ল চন্দ্র সাবাস, সাবাস বলে তাঁর পিঠ চাপড়ালেন।

রাজশাহীতে বেশীদিন থাকতে পারলেন না তিনি। এখানে তাঁর শরীর টেকে না। অসুখ হয় কেবল। আবার বাড়ি ফিরে এলেন। একমাস জ্বরে ভুগলেন। বাবা তাঁকে আর রাজশাহী যেতে দিলেন না। তাঁকে পুনরায় কুচবিহার কলেজে ভর্তি করে দিলেন। এখানে কলেজ ছুটির পর আব্বাসউদ্দিন রোজ আসর জমান। সঙ্গে থাকেন আরো অনেক বন্ধু।

কলেজের মিলাদ। কথা হল কলকাতা থেকে কাজী নজরুল ইসলামকে আনা হবে। নজরুল এলেন কুচবিহার। এখানে নজরুলের সঙ্গে আব্বাসের গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে।

কবি নজরুলের সাথে আব্বাসউদ্দিনের এরপর দেখা হয় দার্জিলিং শহরে। নজরুল গিয়েছেন দার্জিলিং। সেখানে এক সভায় তাঁর আবৃত্তি আর গানের আয়োজন করা হয়েছে। আব্বাস উদ্দিন তখন দার্জিলিং। তিনিও গেছেন সেই সভায়। বিরাট এক হলে সভার আয়োজন। দারুণ ভিড় মানুষের। আব্বাস ভিড় ঠেলে কোন মতে গেলেন ভেতরে। নজরুল তখন তাঁর বিখ্যাত বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি করছেন। মঞ্চে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক। তিনি আব্বাসউদ্দিনকে চেনেন। চোখের ইশারায় তাঁকে মঞ্চের উপর ডেকে নিলেন। কিছুক্ষণ পর নজরুল তাঁকে দেখে মাইকের কাছে টেনে নিলেন গান গাইতে। তিনি গাইলেন নজরুলের একটি গান, আর তাঁর নিজের লেখা নেপালী ভাষার একটি গান-

আজুরে ষাঁউ ষাঁউ
ভলিরে ষাঁউ ষাঁউ
পরিশতো ষাউ যায়না

www.amarboi.org

লাইবরিয়া ষাঁউ ষাঁউ।

এইতো শুরু হলো তাঁর গানের জগতে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন।

বলরামপুর থেকে কুচবিহার, কুচবিহার থেকে তুফানগঞ্জ। সেখানে থেকে আবার কুচবিহার। এখানে কাটল আব্বাস উদ্দিনের ছাত্রজীবন। গানের জীবন শুরু হলো কলকাতায়। এবার সেখান থেকে ঢাকায়। পাকিস্তান হওয়ার পরই তিনি ঢাকায় চলে এলেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাত বারটার পর রেডিও থেকে আব্বাসউদ্দিন প্রথম গান গাইলেন। দেশের গান শুরু হলো তাঁর নতুন জীবন। ঢাকায় এসেও তাঁর একই ভাবনা গান আর গান।

যাঁর মন বড় তিনি কখনো নিজের উন্নতি বা নিজের খ্যাতি নিয়ে খুশি থাকতে পারেন না। তিনি সকলের উন্নতি, সকলের খ্যাতি চান। আব্বাসউদ্দিনও তাই চেয়েছিলেন। বাংলাদেশের লোকগীতি বড় সুন্দর। এখানকার নানা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে নানা রকমের গান। ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, গম্ভিরা, ভাদু, বাউল, বিচ্ছেদী প্রভৃতি কত সুন্দর সুন্দর নাম এসব গানের। আব্বাসউদ্দিন এসব গানকে দেশের সকল প্রান্তে প্রচার করে দেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন বাংলাদেশের লোকগান কত মিষ্টি। তাঁর গান শুনে সবার প্রাণ জুড়ায়ে যেত।

কিন্তু তিনি বেশি দিন সঙ্গীত সাধনার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না। হঠাৎ অসুখ। সহজে ভাল হবার নয়। ভাল আর হলেনও না। তাঁর শরীর অবশ হয়ে এল। কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেললেন। সব শেষ। ১৯৫৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর। সেদিন আব্বাসউদ্দিনের জীবন দীপ নিভে গেল। এক গৌরবে ভরা মহান সঙ্গীত সম্রাটের সাধনা সমাপ্ত হল।

আজো রেকর্ডে তাঁর গান বাজলেই আমরা চমকে উঠি। ঐ তো আব্বাসউদ্দীনের গান হচ্ছে। নজরুলের ইসলামী গান হলেই আসে তাঁর প্রসঙ্গ। আর লোকগীতি? সেখানে রয়েছেন তিনি একক শ্রেষ্ঠত্বের আসনে। সেখানে প্রতিদিন মনে করবার মতো তাঁর কীর্তি। যার জন্য তিনি আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন চিরদিন।

www.amarboi.org

ঠান্ডার বাপ টুনু মিয়া

কিশোরগঞ্জের কেন্দুয়া থানা। এই থানায় ১৯১৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর জন্ম হয় একটি শিশুর। বাবা থানার দারোগা তমিজ উদ্দিন। মার নাম জয়নাবুন্নেসা। তমিজউদ্দিন সাহেবদের পূর্ব নিবাস পাবনা জেলায়। মাত্র কয়েক পুরুষ আগে তারা মোমেনশাহীতে আসেন। প্রথম দরিরামপুর, তারপর মুক্তাগাছা এবং সবশেষে শহরের কাছে কাচিঝুলিতে বাড়ি করেন। দরিরামপুরের নাম তোমরা হয়তো ইতিপূর্বে আরো শুনেছ। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এক সময় দরিরামপুর স্কুলে পড়ালেখা করতেন।

এই শিশু একদিন আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলেন। এক সময় বাংলার কচি সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে পথ চলতে চলতে এর প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হতেন। পাখির কুজন, ঘাস, ফুল, নদীর পানি, নীল আকাশ, সাদা মেঘের ভেলা, জোনাকির আলো-এ সবই তার ছোট মনকে দোলা দিত। তিনি অবাক হয়ে ওসব দেখতেন। আর এসব নিয়ে কতকি ভাবতেন।

তার ডাক নাম টুনু। খুব শান্ত ও ঠান্ডা মেজাজের বলে পাড়ার সবাই তাকে ঠান্ডার বাপ বলে ডাকতো। পড়াশুনায় টুনুর মোটেও মন বসতো না। তার কাছে বিভিন্ন দৃশ্য দেখা, তা নিয়ে ভাবা, ছবি আঁকা ভালো

www.amarboi.org

লাগতো। বন্ধুরা যখন হেসে খেলে কাটাতেন টুনু তখন মাঠের এক কোণে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখতেন। তিনি যা দেখতেন সবই এক সময় বসে বসে কাগজে এঁকে ফেলতেন। তাইতো বড়রা বলতো, আমাদের টুনু একদিন বড় আঁকিয়ে হবে।

বন্ধুরা অনেক সময় টুনুকে খেলার মাঠে নিয়ে যেত। কিন্তু খেলাধুলায় তার মন বসে না। তার ভাল লাগে ঘুরে বেড়ানো কখনো আম-কাঁঠালের বনে, কখনো মাঠে বা নদীর ধারে, নদীর দৃশ্য দেখে, মাঝিদের গান শুনে, পাল তোলা নৌকা দেখে, কাশবনে লুকিয়ে থাকতে। ভাললাগা সব দৃশ্যগুলো মনে গেঁথে যায়। তারপর যখনই একটু সময় পায় খাতার পাতায় এঁকে রাখে সে সব ছবি।

বাবার ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে টুনু বাবার মতো একজন বড় দারোগা হবে। কিন্তু তিনি হলেন জগৎবিখ্যাত একজন শিল্পী। তার দেহ ছিল রোগা, লম্বা। দেহের তুলনায় মাথাটা বড় ছিলো। চোখগুলো ছিল বড় বড়। রাস্তা দিয়ে একটু হেলে দুলে হাঁটতেন।

যদিও টুনুর পড়াশুনায় মন বসতোনা তাই বলে ক্লাসে পরীক্ষায় ফল খারাপ করতেন না। ভালভাবে পরীক্ষায় পাস করে যেতেন। মৃত্যুঞ্জয় স্কুল থেকে শুরু করে টুনু কলিকাতার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করেন। তারপর একে একে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেল। টুনুর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো সারা পাক-ভারত উপমহাদেশে। কতো পুরস্কারে ভূষিত করা হলো তাঁকে। কতো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। কতো ছবি এঁকেছেন, যা বহুল প্রশংসিত। তিনি তাঁর ছবিতে মানুষের দুঃখ-কষ্টগুলোকে জীবন্ত, প্রাণবন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আচ্ছা তা হলে বলতো দেখি, আমরা এতক্ষণ যার এত প্রশংসা করলাম এই টুনু মিয়া-ঠান্ডার বাপ লোকটি কে? তা হলে বলছি শোন। তিনিই শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।

জয়নুল আবেদীনের সাথে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, আবুল মনসুর আহমদ, শওকত ওসমান, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আব্বাস উদ্দিন সবারই ভাল সম্পর্ক ছিল। তিনি যখন বিদেশে ভ্রমণ করতে যান তখন তার সাথে পিকাসো, রিভেরা, সিকোবার মতো বড় বড় শিল্পীদের সাথে পরিচয় হয়। এই মহান শিল্পী হাজার হাজার কৃত্বিমান স্থাপত্য রেখে গেছেন আমাদের জন্য যা বাংলাদেশের আকাশ, বাতাস, মানুষের আচার-আচরণ জীবন-যাত্রা প্রাকৃতিক দৃশ্যকে নিয়ে তাঁর আঁকা ছবি। রেখে গেছেন তাঁর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত শত শত প্রতিষ্ঠান। যা আজো তাঁর সাক্ষ্য বহন করে। জয়নুল আবেদীন শুধু একজন শিল্পীই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সমাজসেবী ও সংস্কৃতি কর্মী। তাই দেশের মানুষ তাকে ভালবেসে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন নাম দিয়েছিলো।

এই মহান শিল্পী ১৯৭৬ সালের ২৮ মে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে আর্ট কলেজ প্রাঙ্গণে চির নিদ্রায় শুয়ে আছেন তিনি।

www.amarboi.org

দানবীর নবাব সলিমুল্লাহ

ঢাকা শহর কবে গড়ে ওঠে, আগে এ শহরের নাম কি ছিলো এনিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ঢাকা শহরের উন্নতি হয়। তিনি নবাব ইসলাম খানকে বাংলার সুবাদার করেপাঠান। ইসলাম খান ১৬০৮খৃষ্টাব্দে ঢাকায় আসেন। তিনি এসে এই শহরের নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর।

জানা যায়, ইসলাম খানের আগেও এখানে একটি শহর ছিল। সেই শহরের নাম ছিল ঢাকা। যা মোঘল আমলের দলিলপত্রে পাওয়া যায়। তাছাড়া ভারতের বিরভূমে এক সময় একটি মসজিদ গড়ে উঠেছিল, এই মসজিদের শিলালিপিতে লেখা আছে "কসবাই ঢাকা খাস।" এ থেকেও বুঝা যায় শহরের নাম ছিল ঢাকা। এই ঢাকা নাম কেন হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। এ নিয়ে অনেক কল্প কাহিনী রয়েছে। তোমরা বড় হলে এসব বিষয়ে জানতে পারবে।

তখন এখানে যে নগরটি গড়ে ওঠে তা ছিল বিরাট। তখন এই শহরের পূর্ব সীমানা ছিল সূত্রাপুর, পশ্চিমে সীমানা নওয়াবগঞ্জ এবং উত্তর-পশ্চিমে সীমানা ছিল মীরপুর। দক্ষিণে বুড়ি গঙ্গার উত্তর তীর থেকে শুরু করে উত্তরদিকে সুদূর টঙ্গী

www.amarboi.org

পর্যন্ত প্রায় সব এলাকা ছিল এই শহরের অধীনে। এক সময় এই ঢাকা শহরের অবনতি হতে থাকে। লোক সংখ্যা কমে গিয়ে মাত্র ৬০ হাজারে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ শাসন আমলেও এ শহরের তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি। তখন ঢাকা শহরে একজন নায়েব-ই-নাজিম রাখার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু নবাব নামে পরিচিত সেই নায়েব-ই-নাজিমের হাতে কোন ক্ষমতাই ছিল না। ফলে তিনিও তেমন উন্নয়ন করতে পারেননি। বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ পুরো এলাকা নিয়ে একটা মৌজা ছিল। তখন এই মৌজার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন সুজাত খান রুস্তমে জামান। তিনি ছিলেন সম্রাট আকবরের পীর সেলিম চিশতির নাতি ইসলাম খান চিশতির সেনাপতি। তাঁর নাম অনুসারে এই মৌজার নামকরণ করা হয় সুজাতপুর।

ঢাকার নবাবদের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এই নবাব পরিবারের একজন সুপুরুষের কথা বলার জন্যই তোমাদেরকে পুরানো ইতিহাসের দিকে নিয়ে গেলাম। যার গুরুত্বপূর্ণ অবদানে এদেশের প্রধান বিদ্যাপিঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে। প্রতিষ্ঠা হয়েছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সহ অসংখ্য এতিমখানা। এই সুজাতপুরেই ১৮৬৬ সালে জন্ম হয় স্বনামধন্য এই মানুটির। তাহলে কে এই মানুষটি? তিনি হলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ। আর এই নবাবের নাম অনুসারে পরবর্তীতে সুজাতপুরের নাম হয় সলিমাবাদ। এই পুরো এলাকার মালিক ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহর পিতা খাজা আহসান উল্লাহ। নবাব সলিমুল্লাহর দাদার নাম কি জানো? নবাব খাজা আবদু গণি ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহর দাদা।

নবাব সলিমুল্লাহ ছোট বেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রিয়। ফলে অভিজাত পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি সাধারণ মানুষের কাছাকাছি অবস্থান করতেন। সাধারণ মানুষের দুঃখকে তিনি নিজের দুঃখ মনে করতেন। তিনি অকাতরে দান খয়রাত করতেন।

নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও নবাবীর ভাব করতেন না। জনগণের কথা চিন্তা করে তিনি মোমেনশাহীর ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আহসান উল্লাহর মৃত্যু হলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী ছেড়ে এসে জমিদারী গ্রহণ করেন। কিন্তু বেশিদিন জমিদারী ধরে রাখতে পারেননি। সকল ধন সম্পত্তি বিলিয়ে দিলেন সাধারণ মানুষের কল্যাণে।

এক সময় তিনি ঋণী হয়ে গেলেন। তাঁর ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র বন্ধক রেখে এসব ঋণ শোধ করলেন। সোনালী ব্যাংক সদরঘাট শাখায় এখনও নবাব সলিমুল্লাহর বন্দক রাখা সিন্ধুক "দরিয়ায়ে নূর" রক্ষিত আছে। পৃথিবীর যে কোন

www.amarboi.org

দেশে মুসলমানরা কষ্টে আছে জানলেই নবাব সলিমুল্লাহ অর্থ পাঠিয়ে দিতেন। সুদূর তুরস্কে ভূমিকম্প হয়েছে, সেখানে মানুষ কষ্টে আছে, সলিমুল্লাহর মন কেঁদে উঠলো। তিনি তাদের সাহায্যে টাকা পয়সা পাঠিয়ে দিলেন।

শুধু কি তাই ? তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি সলিমাবাদ মৌজাও বিলিয়ে দিলেন জাতির কল্যাণে। তাঁর সম্পত্তির উপর গড়ে উঠলো ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়। নাম রাখা হলো পিতা খাজা নবাব আহসান উল্লাহর নামে আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিলেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র হল 'সলিমুল্লাহ হল" নামে এখনো তাঁর স্মৃতি বহন করে আছে। যার নাম ছিল এক সময় "সমিুল্লাহ মুসলিম হল"। দেখো আমরা কতো অকৃতজ্ঞ জাতি, যে মানুষ তার সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে এতো বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করে গেলেন আমরা তাঁর জন্য কি করেছি? কিছুই না। বরং তাঁর ইতিহাস পর্যন্ত মুছে দেয়া হয়েছে। তাঁর পিতা খাজা আহসানউল্লাহর নাম বাদ দিয়ে আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনির্ভার্সিটির নাম করা হয়েছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের মুসলিম কথাটি বাদ দিয়ে করা হয়েছে সলিমুল্লাহ হল। অথচ মানবদরদী সলিমুল্লাহ মুসলমানদের জ্ঞানেগুণে বড় হওয়ার কথা চিন্তা করেই নিজের সমস্ত সম্পদ দান করে যান এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য।

নবাব সলিমুল্লাহ সব সময় ছিলেন অবহেলিত মুসলমাদের পাশে। তিনি ছিলেন ইংরেজদের অত্যাচারের সময় মুসলমানদের একমাত্র মুখপত্র। তিনি ছিলেন মুসলমানদের হারিয়ে যাওয়া গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে আজীবন সচেষ্ট। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ফলেই ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশকে দুই ভাগে ভাগ করে, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও আসাম নিয়ে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ গঠন করেন। তোমরা হয়তো শুনে থাকবে ইতিহাসে যা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে পরিচিত।

জনদরদী এই নেতা ১৯১৫ সালের ১৬ জানুয়ারী পরলোকগমণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা সলিমুল্লাহ এতিমখানাসহ বহু প্রতিষ্ঠান তাঁর স্মৃতিবহন করে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ তাঁর ইসলাম দরদী ও ন্যায় পরায়ণতার কারণে আজ ইতিহাস থেকে এসব অবদান দিন দিন মুছে ফেলা হচ্ছে।

বন্ধুরা, চলোনা আমরা জেগে ওঠি। ইতিহাসের পাতায় পাতায় খুঁজে দেখি আমাদের এসব দানবীর মানুষদের গৌরব উজ্জ্বল অতিত। তা না হলে আমাদেরকে প্রবেশ করতে হবে এক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩।

ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১।